অনুপমা

মণীন্দ্র গুপ্ত

কোথাও পূরোপূরি অস্বীকার করা হয়নি। উপনিষদে, গীতায়, সিদ্ধাচার্যের গানে, বৈষ্ণব কবিতায়, এমন কি কীর্ত্তন-বাউলে—প্রায় সর্বত্রই ঘোষণা করা হোয়েছে—জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের পথ দুর্গম দেহ-অরণ্যেরই ভেতর দিয়ে।

আব তাছাড়া মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও একটা কথা আছে। মন-বিজ্ঞান বলে—অবদমিত বাসনা থেকেই সমস্ত ব্যাভিচারের সৃষ্টি। আর আমাদের অভাব-নিষ্পেষিত দৈনন্দিন জীবনে অধিকাংশ বাসনাই অচরিতার্থ থেকে যায়। ফলে মানুষের শেষ পর্যন্ত যা থাকে—তা লালসা। তাই মেয়েদেরো বেরুতে হয় অফিসে—আর গভীর রাত্রে সমুদ্রের বুকে ছেলেরা দেয একাকী পাড়ি। ক্রমাগত পেশী-সঞ্চালনে ছেলেরা কিছুটা অসহিষ্ণু—আর আত্ম-নিপীড়নের স্বাভাবিক অভিলাষে মেয়েরা যথেষ্ট সহজ-লভ্য। অন্ততঃ প্রতিভাবানদের কাছে। তাই আজকের ছেলেরা মেয়েরা উদ্যত বলেই উদ্ধত। এখন কেউ যদি এ বই পড়ে বলে এ কি হোল, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মত আমাকেও একটা দীর্ঘশ্বাসের সংগে বলতে হয়—"তবে বৃথাই এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।"

এবারে ধন্যবাদ বিতরণের পালা। বই লিখেছি আমি, ছবি এঁকেছে প্রীতিভাজন শ্রীমান নিতাইচন্দ্র দে—আর সমস্ত ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে সাহায্য কোরেছে বন্ধু-বান্ধবেরা। এই সুযোগে এদের সকলকেই ধন্যবাদ।

আর প্রুফ-দেখার ব্যাপারে যে দোষ ত্রুটি র'য়ে গেল—সেটা বাংলা বইতে মোটেই নোতুন নয়।

৫৮।১এ দেবেন্দ্র ঘোষ রোড,
কলিকাতা—২৫।
মহালয়া, ১৩৫৭।

মণীন্দ্র গুপ্ত

উৎসর্গ

এক সংগে পথ চলতে গিয়ে যে আমায় চিরদিনের মত বিচ্ছেদ উপহার দিয়ে গেছে —আর সহস্র আহ্বানেও কোনদিন যে আর ফিরে আসবে না; অথচ এখনো যে আমার রক্তের ভেতরে—যে আমার স্বপ্নের ভেতরে ছড়িয়ে আছে—জড়িয়ে আছে; যার কথা সহসা মনে হোলে রাত্রি এখনো আমার দুঃস্বপ্নে ভরে ওঠে, আর পরদিনের অরুণোদয় ব্যর্থ হোয়ে যায়—সেই পরলোকগত, প্রতিভাবান, প্রিয়দর্শন, সাহিত্য-রসিক—

৺সুনীলকুমার দাশগুপ্ত, বি, এস, সি (অনার্স)

অবিস্মরণীয়েষু—

এই লেখকেরই লেখা—

লঘুছন্দ। (কবিতা-সঞ্চয়ন)

শীঘ্রি বেরুবে—

বনজ্যোছ্‌না—(কবিতা-সঞ্চয়ন)

অধরা—(গল্প-সঞ্চয়ন)

প্রাচীন বংগ সাহিত্যের অন্য একদিক (প্রবন্ধ-সঞ্চয়ন)

এক

এই পথটি অনুপমার অতি পরিচিত। কত দীর্ঘ দিনের স্মৃতি যেন জড়ানো রয়েছে এই পথের প্রতিটি স্পন্দনে। পোষ-মাঘের দিনে স্কুল ছুটির পর যখন বিষণ্ণ হোয়ে আসে বিকেলের আলো আর দু-পাশের স্তম্ভিত পাইন গাছের ভিতরে ঝির্‌ঝির্‌ শব্দে বাজে আসন্ন সন্ধ্যার পূরবী—একটা ফার্‌ কোটে নিজেকে সম্পূর্ণ আবৃত কোরে অনুপমা হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় অনেক দূর। আঁকা-বাঁকা-সরু পায়ে-চলা-পথ। আদি অন্ত তার দেখা যায় না। আর এখান থেকে সহরও অনেক দূর। রাত্রে উৎকর্ণ হোলে শুধু ষ্টেসনের শেষ মেল ট্রেণটার যাবার শব্দ শোনা যায়। তাও অত্যন্ত অস্পষ্ট—আবছা আবছা।

সহরের এক প্রান্তে অনুপমার ভিক্টোরিয়া গার্লস্‌ স্কুল। অদ্ভুত সুন্দর এই স্কুলের অট্টালিকা। একটি আলুলায়িত

প্রাচীরের ভিতরে আবদ্ধ হোয়ে আছে যেন কত যুগ ধোরে এই স্কুলটি। একখণ্ড সবুজ মাঠের টুক্‌রো এর সংলগ্ন। এই টুক্‌রো প্রান্তরকে মেয়েরা বলে 'লন্'। ছোট মেয়েদের কচি মুখের মতই এই 'লন্‌টি' সব সময়ে ঝল্‌মলে। বিকেলে স্কুল ছুটির পর মেয়েরা যখন 'লনে' এসে সমস্ত দিনের ক্লান্তিকে মুক্ত কোরে দেয়—মনে হয় সবুজ মাঠে প্রজাপতিদের এই বর্ণ-বৈভবে ভিক্টোরিয়া স্কুলের আবার নোতুন কোরে পিরিয়ড্ বসে। কী অদ্ভূত তখন লাগে অনুপমার! সমস্ত স্কুল কম্পাউণ্ড-এর স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ কোরে—পাশের কুয়াশা-ম্লান বিক্ষিপ্ত এস্-বেষ্টসের বাড়ীগুলোতে সে কলরব প্রতিধ্বনিত হোয়ে নিশ্চিহ্ন হোয়ে শেষে মিলিয়ে যায় সহরের দিকে। এই কয়েকটি মুহূর্ত, স্ফূর্তিতে উজ্জ্বল—প্রাণ-প্রাচুর্যে উদ্বেল হোয়ে ওঠে অনুপমার মন। সমস্ত রাত্রিতে তার নিঃসঙ্গ একক অনুভূতিতে এরই বিচ্ছুরিত রেখা তার ঘুমের গোধূলিতে বারবার করে অভিসার।

প্রথম প্রথম অনুপমা অবাক হোয়ে শুধু চেয়ে থাক্‌তো সাদা দেয়ালগুলোর দিকে। সুইচ্ অফ্ কোরে তার বিস্তৃত শয্যার একপাশে নির্মেঘ আকাশের বিষণ্ণ শশি-লেখাটির মত থাক্‌তো স্তম্ভিত হোয়ে। প্রহরের পর প্রহরের পরিক্রমার মাঝখানে অনুপমা অস্থির হোয়ে উঠ্‌তো—কখন রাত্রির স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ কোরে আকাশের গায়ে কনক উষার রক্তরাগ ছড়িয়ে পড়বে। আর রাত্রি ভোর না হোতেই অনুপমা উঠে এসে দাঁড়াতো তার সদ্য-ঘুম-ভাঙা চোখ দুটো নিয়ে জানালায়। শিশির-স্নাত

সাম্‌নের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের শেষপ্রান্তে যেখানে অস্পষ্ট হোয়ে আছে বহু-প্রতীক্ষিত সবিতার আসন্ন অভিসার মুহূর্ত—অনুপমার চোখ দুটো উধাও হোয়ে চলে যেতো সেখানে। তার ব্যাকুলিত দৃষ্টির সীমান্তে একটু একটু কোরে ছড়িয়ে পড়তো লাল-সূর্যের আভা—আর অনুপমা খুসীতে উজ্জ্বল হোয়ে ফিরে আস্‌তো ভিতরে। স্টোভ ধরিয়ে কেৎলি চাপিয়ে দিয়ে চলে যেতো বাথ রুমে। তারপর বাথ রুম থেকে সুগন্ধি সাবানের স্নিগ্ধতায় সর্বাঙ্গ সুরভিত কোরে ফিরে এসে বোসতো স্টোভের পাশে। প্রভাতী পানপর্বের শেষে রবীন্দ্র রচনাবলীর কোনো একটি খণ্ডকে আশ্রয় কোরে একটি বেতের চেয়ারের ভিতরে আকণ্ঠ মগ্ন হোয়ে থাক্‌তো অনুপমা। কাঁচা সোনার মত রোদ্দুর এসে পড়তো তার গায়ে—পায়ে—তার মাথার উজ্জ্বল কালো চুলের সমুদ্রে। সাড়ীর প্রান্ত অনুপমার ঝল্‌মল্‌ কোরে উঠতো সে অবিচল রৌদ্র-দীপ্তিতে।

তারপর নটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে হাতের বইটা তার আপনা থেকে বন্ধ হোয়ে আস্‌তো। ক্লান্তির একটা ইংগিত সমস্ত মুখের ওপর বহন কোরে অনুপমা উঠে এসে দাঁড়াতো আবার সেই জানালায়। সমস্ত ঘরের ভিতরে শুধু এখানেই তার জন্য সঞ্চিত হোয়ে থাক্‌তো মুক্তির অজস্র আহ্বান। কিন্তু সেখানেও তাব'লে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো চলে না তার। শ্লথগতিতে এসে ইকমিক্‌ কুকারে রান্নার আয়োজন কোরে নিজেকে প্রস্তুত কোরতেই চার্চের ঘড়িতে বাজতো দশটা। সাড়ে দশটায় তার স্কুল।

আর স্কুল থেকে ফিরে এসে নিজেকে তার মনে হোত ভারী একা। রাত্রির এই নির্মম দীর্ঘতায় অনুপমা আর্তনাদ কোরে উঠ্‌তো মনে মনে। ঘুম আস্‌তো না কিছুতে—স্বপ্নের আনন্দেও তার চোখের পাতা এতোটুকু ভারী হোয়ে উঠ্‌তো না। এক একদিন চোখ ভ'রে জল আস্‌তো তার—বালিশের ভেতরে জোর কোরে মুখ আর বুক চেপে প্রার্থনা কোরতো—ভগবান ঘুম দাও। তারপর কেমন কোরে যেন একদিন ম্লান হোয়ে গেল তার অশ্রু-রেখা, রাত্রিতে চোখ ভ'রে ঘুম নাম্‌লো—আর সে ঘুম সকালের ঘাটে না এলে ভাঙ্‌তো না।

অনুপমার এই সাতটি বছর যেন সাতটি শতাব্দীকেও অতিক্রম কোরতে পারে। একদিন যে রাত্রি-ভরা অবসাদ আর ছুপুর-ভরা অস্থিরতার কুয়াশায় বিবর্ণ হোয়েছিল তার রাত্রি দিন, সে ব্যর্থতার সীমান্তে অবশেষে যেদিন নাম্‌লো স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার বসন্ত, অনুপমা হিসেব কোরে দেখলো তার বিস্তৃত ব্যবধানের সমুদ্র সাতটি বছরের অসংখ্য বেদনার স্মৃতি-তরঙ্গ নিয়ে হোয়ে আছে উজ্জ্বল। নিউ যসিডির আকাশ দেখতে দেখতে হোয়ে গেল পরিচিত—বৃষ্টির ছন্দে আর রৌদ্রের গন্ধে সমস্ত যশিডিকে ভালোবেসে ফেল্‌লো অনুপমা।

মাঝে মাঝে চিঠি আসে অরুণার। আর সে-চিঠি না খুলেই অনুপমা বুঝতে পারে, তার দীর্ঘ জীবনের মঙ্গল কামনা কোরে শেষ পর্যন্ত একটি নোতুন মিনতিতে হয়তো বিনীত হোয়ে উঠেছে অরুণার কণ্ঠ। তবুও অসম্ভব না হোলে অরুণার প্রার্থিত স্বপ্নকে

সার্থক কোরতে সে এতটুকু ইতস্ততঃ করে না। আর মনি অর্ডারের কুপনের প্রান্তে ছড়িয়ে দেয় মাত্র দুটি কথার দীণতা—'বুঝি, সত্যি তোর কষ্ট হোচ্ছে রুনী—তবু নিজের গুণে তুই তোর অক্ষম দিদিকে ক্ষমা করিস্।'

আর এই প্রসঙ্গে যে দৃশ্যটি তার চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে সেটি তার জীবনাকাশে ধ্রুবতারার মত স্থির। বাবার মৃত্যু শয্যায় পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কোরেছিল অনুপমা—আর সে অঙ্গীকারের ভাষা এখনো তার কাছে উজ্জ্বল। কণ্ঠ জড়িয়ে আস্‌ছিল বিকাশ বাবুর—অরুণার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বারবার বোঝাতে চাইছিলেন মাতৃহারা মেয়েটি যেন তার উপস্থিতির অভাব না অনুভব করে। পায়ের ওপর তাই সমুদ্রপারে প্রণত মূর্ছিত একটি তরঙ্গের মত নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন কোরে অনুপমা বলেছিল : 'তোমার অরুণার শিক্ষার ভার আমি নিয়েছি বাবা। আমাকে আশীর্ব্বাদ কোরে যাও।' এখনো সে কথা ভাবলে অনুপমা স্তম্ভিত হোয়ে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ জান্‌লা দিয়ে। অথচ সে তখন মাত্র আঠারো বছরের একটি অনতিস্ফুট বালিকা।

কলেজে পড়ার সমস্ত রঙীন স্বপ্ন ব্যর্থ হোল অনুপমার। চলে এলো সে ভিক্টোরিয়ায়। আর অরুণা আজ এখানে কাল সেখানে—এভাবে ঘুরে ঘুরে সমস্ত আত্মীয়দের বিচিত্র মানস-তরঙ্গ আলোড়িত কোরে—ব্যর্থতা আর বেদনার প্লাবনে ভাস্‌তে ভাস্‌তে যেখানে এসে দাঁড়ালো—সেটা কোল্‌কাতার কোনো একটি মেয়েদের কলেজ-হোষ্টেল। এখন সে ফার্ষ্ট ইয়ারের

অরুণা রায়। সারা চোখে মুখে নব যৌবনের উচ্ছলতা—বসন্তের মাধবী-মঞ্জরীর মত রূপ তার স্নিগ্ধ—আর বৃষ্টি-স্নাত নোতুন দূর্বার মত সমস্ত দেহ তার এক অভিনব অনুভূতিতে লীলায়িত আর বিচিত্র আর মনোহর।

অথচ এই বিস্তৃত জীবনের মরুভূমিতে এখনো পর্যন্ত কারো পদধ্বনি শুনতে পেলনা অনুপমা। তার পঁচিশটি বছরের সূর্য ক্ষয়ে গেল নিঃশেষ হোয়ে। স্নান কোরে এসে আয়নার সাম্‌নে বহুবার প্রসাধনের সময় নিজেকে তার মনে হোয়েছে একা—কী ভীষণ একা সে! রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে আয়নায় অতর্কিতে প্রতিফলিত নিজেকে দেখে কেবলি বিস্মিত হোয়েছে অনুপমা। এই অন্ধকার—এই ঘরের স্তব্ধতা তাকে বিদ্রূপ করে। আর অনুপমা জানালায় দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে যশিডির আকাশের দিকে। নক্ষত্র-খচিত ওড়না গায়ে যশিডির আকাশ ঝল্‌মল্‌ কোরতে থাকে আপন খুসীতে—আর অনুপমা নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে নিঃস্ব—অতি রিক্ত সে। কঠিন রেখায় আবদ্ধ দেহ তার যেন শিথিল হোয়ে আস্‌ছে—হাতের মুঠি হোয়ে আস্‌ছে আল্‌গা। অনুপমা কী তবে যৌবন-সীমান্ত অতিক্রম কোরলো?

শুধু একটি রাত্রির স্মৃতি অশ্রুতে এখনো যেন তার প্লাবিত হোয়ে আছে। অনুপমা ভাবতেই পারেনা সে রাত্রির কথা। শুয়ে ছিল বিছানার একপাশে—স্বপ্ন দেখে দেখে ক্লান্ত হোয়ে এসেছে তার চোখের পাতা, আর বাইরে শ্রাবণের মেঘ-মেদুর

আকাশ থেকে অবিশ্রান্ত ধারায় ঝরে যাচ্ছে বর্ষা। জানালার কাঁচে এসে সে শব্দ বাজছে জলতরঙ্গের মত—তারি ছন্দে ছন্দে ঘুম নেমে আসছে চোখে, আর ঠিক এমনি সময় বন্ধ দরজায় একটি মৃদু আঘাতেই উতলা হোয়ে গেল অনুপমা। ঘুম-ভরা চোখে এসে দরজা খুলে দিতেই ভেতরে যে ঢুকে পড়লো সে রেন্ কোটে-ঢাকা উনিশ বছরের গৌতম হালদার ছাড়া আর কেউ নয়। মাথার চুলে—গায়ের পাঞ্জাবীতে আর কাপড়ের অঙ্গে অঙ্গে তার অসহ্য দারিদ্র্য আর বর্ষার অসংখ্য উচ্ছ্বাস। তিন মিনিট ধোরে তীব্রভাবে তাকে লক্ষ্য কোরেও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি অনুপমার—আর গৌতম কী যেন একটু ভেবে অনুপমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়েছিল একটি অভিশপ্ত পল্লবের মত। সেদিন তার বৃষ্টি-ভেজা চোখের পাতা অনুপমার পায়ের স্নিগ্ধতাকে গ্রাস কোরেছিল।

"আমাকে আজকের মত একটু আশ্রয় দিন্—"গৌতমের কণ্ঠ ভারী হোয়ে এল। "কাল সকালেই আবার চলে যাবো। শুধু কথা দিন্ - পুলিশের কাছে কোনো কথাই প্রকাশ কোরবেন না। আমার চলে যাবার পরে রাত্রি ফুরিয়ে যাবে, আর রাত্রি ফুরিয়ে গেলে হয়তো গ্রেফ্তারের পরোয়ানা নিয়ে ওরা আসবে আপনার বাড়ী। আপনার কাছে তাই মিনতি—শুধু এই রাত্রি-টুকু আপনার ঘরে আমায় থাক্তে দিন্। বিশ্বাস করুন আমি অপরাধী। আর আপনার কাছে স্বীকার কোরতে আমার ক্ষতি কী—আমি দেশদ্রোহী। কিন্তু এই রাত্রির বর্ষা—এই রাত্রির

অন্ধকারে আমি আত্ম-গোপন কোরে সমস্ত দিনের লুকিয়ে বেড়ানো সার্থক কোর্‌তে চাই। তাই আপনার পায়ে হাত দিয়ে মিনতি কর্‌ছি—”আর একবার অনুপমার পা দুটো স্পর্শ কোরলো গৌতম,—“আজকের রাতটার মত আমায় আশ্রয় দিন্।”

সামান্য একটু স্তব্ধতার পর হাঁত দুটো ধোরে তাকে উঠিয়ে অনুপমা স্থির হোয়ে গৌতমের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলো। সাধনার কি বিরাট উন্মাদনায়—প্রতীক্ষার কী মহান্ গৌরবে গৌতম আজ সর্বহারা। গৃহ-চ্যুত—আত্মীয়-প্রত্যাখ্যাত সে। দুর্বহ জীবনের অভিশাপ একাকী মাথায় কোরে চলেছে। তবু তার মনে আজো এলোনা এতটুকু ম্লানিমা। শুধু এক অদ্ভুত স্বপ্নের গুঞ্জনে সমস্ত ভবিষ্যৎ দুটি চোখে তার উজ্জ্বল হোয়ে আছে। আগামী দিনের সে আলোক রেখাও যেন চোখের ভেতরে অস্পষ্ট দেখতে পেলো অনুপমা। আর মন্ত্রমুগ্ধের মত তারি আনন্দের আবেগে সে চলে গেল ভেতরে।

বিছানার সম্পূর্ণ অধিকার সে-রাত্রির মত গৌতমকে ছেড়ে দিয়ে জানালার পাশে ইজি চেয়ারটা টেনে আন্‌লো অনুপমা। শার্সীটা খুলে দিয়ে তার সাদা স্নিগ্ধ হাতখানি বাড়িয়ে দিলো বাইরে। ঠাণ্ডা বৃষ্টির টুক্‌রো যশিডির আকাশ ভেঙে পড়ছে। দূরে অস্পষ্ট কুয়াশার মত স্তম্ভিত হোয়ে আছে পথভ্রান্ত মেঘের দল। খোলা জানলার পাশে হাওয়ায় চুল উড়তে লাগলো অনুপমার। আর দুটি করপুট ভ'রে শ্রাবণের অকৃপণ দাক্ষিণ্য বহন কোরে সমস্ত মুখে চোখে স্নিগ্ধতার অঞ্জন বুলিয়ে দিলো সে।

সাদা আঁচল তার সেদিন ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আর মনে হোল বাতায়নে আজকের শ্রাবণের এই অভিসার এক বিন্দু অশ্রু দিয়ে হয়তো চিরদিন তার মনে উজ্জ্বল হোয়ে থাক্‌বে।

বিছানার পাশে গৌতমের ঘুমন্ত মুখের খুব কাছে একবার এসে বোসলো অনুপমা। এই করুণ—অতি অসহায় একটি মূহূর্তে গৌতমকে যখন মনে হোল ক্লান্ত, অনুপমার ইচ্ছে হোল একটিবার শুধু তার মাথার চুলে আর বিবর্ণ মুখে সে হাত বুলিয়ে দেয়। প্রসারিত হাতখানা তবু কেন যেন সঙ্কুচিত হোয়ে এলো তার। অনুপমা মনে মনে প্রার্থনা জানালো রাত্রির দীর্ঘতার আর ব্যর্থতার জন্য নিজেকে দিলো অজস্র ধিক্কার।

বসে থাকতে থাকতে পা দুটো ভারী হোয়ে এল তার। সম্পূর্ণ আনমনা হোয়ে প্রশস্ত শয্যার একটি দিকে তনুলতাকে তার বিস্তৃত কোরে দিলো সে। বৃষ্টির বেগ শিথিল হোয়ে আসছে আর খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টি শেষের ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগছে তার সর্বাঙ্গে। অনুপমা পাশ ফিরে একবার গৌতমের মুখের দিকে তাকালো। মাঝখানে তাদের ব্যবধান আস্তে আস্তে হোয়ে এলো সংকীর্ণ। ভয় হোল অনুপমার, তার তপ্ত নিঃশ্বাসে আর হৃদস্পন্দনের অসহ্য উত্তাপে যদি গৌতমের ঘুম ভেঙে যায়। অতি সন্তর্পণে তাই গৌতমের একটি হাত নিজের হাতের ভেতরে চুরি কোরে আনলো অনুপমা। তারপর সে হাতখানি তার বুকের উপর চেপে ধরলো শক্ত কোরে। তরঙ্গিত সমুদ্রের মত বুকের উত্থান পতনের সঙ্গে সে হাতখানিও ছন্দিত হোতে লাগল

রাত্রি ভ'রে। আর গৌতম হালদার একটি রাত্রিতে জীবনের সমস্ত অবসাদের বোঝা নামিয়ে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নিজেকে কোরলো ভার মুক্ত।

ঘুম যখন ভাঙলো, আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে পেলো গৌতম, নোতুন প্রভাতের প্রতি শুকতারার লক্ষ্য স্থির। অথচ একটি হাতের প্রতি অনুপমার এই অযাচিত করুণার কথা ভেবে সমস্ত শরীর তার আবেগে চঞ্চল হোয়ে উঠলো। হাতখানিকে মুক্ত কোরতে গেলে যদি অনুপমার ঘুম ভেঙে যায়—এই ভেবে সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হোয়ে রইলো। তারপর অতি সন্তর্পণে হাতটি ছাড়িয়ে নেবার সময় সামান্যতম আঘাতে অনুপমার ঘুম ভেঙে গেল। আর অনুপমা অপরিসীম লজ্জায় অমনি দু হাতে মুখ ঢেকে সদ্য-ঘুম-ভাঙা চোখ দিয়ে সমস্ত রাত্রির ইতিহাস কল্পনা কোরে মনে মনে বিষণ্ণ হোয়ে উঠলো।

এক মুহূর্ত্তে বিছানা ছেড়ে চলে এলো গৌতম দরজার কাছে। এখনো আকাশের গায়ে ছড়ানো রয়েছে নক্ষত্রের উৎসব অবশেষ। এই স্তিমিত ভোরে—সূর্যের এই নম্র নীল স্বপ্ন সার্থক হবার আগেই তাকে চলে যেতে হবে। সামনের পথ অনন্ত—সে পথে ব্যর্থতা আর বেদনা, ভয় আর অবসাদ। তবু চলে যাবার জন্য একটা পা বাড়াতেই বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে দরজাটা পিঠ দিয়ে আটকালো অনুপমা। তারপর গৌতমের পাঞ্জাবীর একটা খোলা বোতাম আটকাতে আটকাতে জিজ্ঞাসা করলো—

'কী নাম আপনার?'

'গৌতম। আর আপনার ?'

'অনুপমা।'

'আজ থেকে তুমি আমার অনুদি'—বলতে বলতে একটা মৃদু হাসিতে সুন্দর হোয়ে গৌতম একবার নীচু হোয়ে অনুপমার পা দুটো স্পর্শ কোরে বলে উঠলো—'আর আমি তোমার গৌতম। এখন আসি কেমন ?'—

'এসো'—এই কথাটাও যেন স্পষ্ট কোরে সেদিন বোলতে পারলো না অনুপমা।

পরের দিন সমস্ত সকালে ঘুরে ঘুরে সে কথাটাই মনে পড়ল অনুপমার। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হোয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ। সমস্ত কাজ পড়ে রইলো তার। কুকার জ্বললো না, বইএর একটা পাতাও সে ভালো কোরে পড়তে পারলো না সেদিন। কে এসেছিল তার মনের মরুভূমিতে আর কেনই বা এমন কোরে তাকে সে চঞ্চল কোরে গেল ? স্কুলে গিয়ে মেয়েদের কিছু লিখতে দিয়ে সে শুধু চেয়ে রইলো জানালার ভেতর দিয়ে দূরের নির্বিকার আকাশের দিকে। অখণ্ড অবারিত নীলিমার সমুদ্র আকাশে। অথচ তার মন জ্বলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে ছাই হোয়ে। কেন—কেন এই রিক্ততা, এমন ব্যর্থতা তার ?

সে রাত্রে আবার বর্ষার ছন্দ শোনা গেল জানালার কাঁচে—অথচ গৌতম এলো না। যেখানটিতে শুয়ে ছিল গৌতম আগের রাত্রে অনুপমা তারই ওপর বুক পেতে দিলো আলগোছে—খুবই ধীরে ধীরে। বুঝলো রাত্রির উত্তাপ এখন এসেছে স্নিগ্ধ হোয়ে

তবু ভাল লাগলো তার নিজের এই দীণতাকে — এমন আকুলিত হোয়ে যৌবন সীমান্তে এসে একটি নিষ্পাপ ফুলের সুরভিকে গ্রহণ কোরতে।

তারপর বহুদিন অতিক্রান্ত হোয়েছে অনুপমার। মনেই পড়ে না সেদিনের স্মৃতির উত্তাপ। আর সে কথা চকিতে মনে হোলে লজ্জায় ঠোঁটের ছু পাশে একটি সূক্ষ্ম হাসির রেখা পড়ে তার। তবু যেদিন রাত্রে নামে বর্ষা, সমস্ত যশিড়ির বুকে বাজতে থাকে মেঘের মৃদঙ্গ, একটি বিগত রাত্রির স্মৃতির প্রতি প্রণতিতে অবসন্ন হোয়ে আসে অনুপমার সারা দেহ, সারা মন। এই ভালো, অনুপমা ভাবে এই-ই যেন চেয়েছিল সে চিরদিন। তার নির্জন সমুদ্র তীরে একদিন যে অপরিচিত অতিথিটির পদধ্বনি শুনে বিস্মিত হোয়ে গিয়েছিল সে—সেইটুকুই সমস্ত জীবন ভ'রে তার কাছে স্মরণীয় হোয়ে রইল। একটি রাত্রির ইতিহাস, একটি শয্যায় তাদের ক্ষণকালের যুগ্ম উপস্থিতি—সে কথাই কল্পনা কোরে অনুপমা উজ্জ্বল হোয়ে উঠলো মনে মনে।

আর আজকে অনুপমা পৃথিবীর এমন একটি প্রাণী সমস্ত জীবন ভরে যার শুধু ব্যর্থতা, বেদনা আর প্রতীক্ষা। অথচ ওর দিকে—ওর মনের বন্ধ দরজায় কারো হাতের স্পর্শ এখনো এসে পৌঁছলনা। তবে কি, অনুপমা ভাবলো একবার, দেখতে সে সুশ্রী নয়? বিছানা থেকে উঠে এলো আয়নায়। দেখলো নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাভরণ কোরে। কই—রাত্রির এমন অন্ধকারেও অনুপমা আবিষ্কার করলো, তাকে তো অমনোযোগ দেওয়া যায়

না। সমস্ত মুখে—সমস্ত বুকে এখনো তার যৌবনের কঠিন উচ্ছলতা—দু' চোখে এখনো তার তৃষ্ণার উদ্ধত উত্তাপ। রূপের পৃথিবীতে সে এখনো রিক্ত নয়—লাবণ্যের প্রতিশ্রুতি এখনো তার অঙ্গে অঙ্গে উজ্জ্বল।

মাঝে মাঝে ইস্কুলের দু'একটি মেয়েকে নিজের ঘরে ভুলিয়ে নিয়ে আসে অনুপমা। হাত ভ'রে চকোলেট সাজিয়ে দেয়—আর তার বিনিময়ে শক্ত করে চেপে ধরে বুকের ভেতরে যেখানে সঞ্চিত হোয়ে আছে তার সুদীর্ঘ বঞ্চনার ব্যর্থতা। চোখ ভ'রে জল আসে তার। আর কেবল ভাবে—এমন একটি মেয়েকে প্রাণভরে সে শুধু চেয়ে দেখবে। এই পুতুলের মত এই নতুন ননীর মত লীলায়িত একটি চঞ্চল তনুলতা ঘরময় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে আর অসংখ্য কাজের ভেতরে অনুপমা ভাববে, এই স্ফূর্তি ভরা চঞ্চলতা - এই উজ্জ্বল প্রাণপ্রাচুর্য যেন কোনদিনো না নিঃশেষ হোয়ে যায়। এমন একটি উজ্জ্বল উপহার তার সমস্ত মনে উৎসাহের প্রদীপ জ্বালবে—আর অনুপমা অবাক হোয়ে সে কথা ভাববে, কেবল ভাববে।

দুই

ক্যাথেড্রাল থেকে ঢং ঢং কোরে রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আর্কেডিয়া হষ্টেলের একটি ঘরের দরজা বন্ধ হোয়ে এলো। অহেতুকী আবরণ থেকে নিজের উত্তমাঙ্গ বিদ্যুৎ গতিতে মুক্ত কোরে আনলো অরুণা রায়—তারপর আয়নার কাছে এসে খুব ভালো কোরে নিজেকে লক্ষ্য কোরবার পর একটা পাতলা সিল্কের কালো রংএর ব্লাউজ ধীরে সুস্থে নিজের গায়ের সঙ্গে জড়ালো। তার স্ফীত শক্ত অসমতল বুকের উপর কালো ব্লাউজটায় মনে হোলো যেন পত্রপুটে আবৃত রয়েছে দুটি অনাঘ্রাত অনাস্বাদিত পুষ্প স্তবক। শেষে নীবির বন্ধন একটু শিথিল কোরে দিয়ে এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়লো এসে বিছানার সাদা সমুদ্রে। কিন্তু সে আকস্মিক আবেগের ভার বহন করার সাধ্য ছিল না তার নীবির সূক্ষ্ম গ্রন্থির—তাই শেষ বসন হীনতায় অরুণা রায় হোল সম্পূর্ণ

নীবি মুক্ত। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত বাড়িয়ে অমনি শেলফের ভেতর থেকে মার্চেন্ট অফ ভিনিসের বইখানা টেনে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে আবৃত্তি কোরে চললো অরুণা—In such a night....

দু' বার পড়বার পর আবার সে উঠে দাঁড়ালো। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আলগোছে দরজার খিলটি দিলো খুলে। মুখ বাড়িয়ে একবার অনুভব করলো—এরি মধ্যে কোলাহল মুখরিত এতবড় আর্কেডিয়া স্বপ্নের মত নিস্তব্ধ হোয়ে পড়েছে। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। কেবল মাঝে মাঝে মেয়েদের নিদ্রিত ঠোঁটের ভেতর দিয়ে ভেসে ভেসে আসছে তাদের একান্ত পরিচিতদের নাম। মুখ টিপে একবার হাসলো অরুণা। তারপর এসে বিছানায় আবার সমাহিত হোল। ইচ্ছে কোরেই সুইচ্টা অফ্ কোরলো না।

আর অরুণার ঘুমের গোধূলিতে তার দেহ-সরোবরে দরজা দিয়ে যার ছায়া এসে পড়লো—সে একটি নারীমূর্তির। অরুণার কাছে খুবই পরিচিত তার পদধ্বনি।

অতি সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ কোরে দিলো সেই নারীমূর্তিটি। তারপর আস্তে আস্তে দেহের ওপর থেকে সাড়ী-খানা যখন মুক্ত কোরলো—তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো আর্কেডিয়া কলেজের বাংলা সাহিত্যের তরুণ অধ্যাপক। অরুণা দেখতে পেল না তার এই অভিসারের দীণতা—এমন কুণ্ঠিত পরিবেশ। ঘুমের অতল সমুদ্রে সে তখন স্নিগ্ধ হোয়ে আছে একটি মাত্র আবেদনে—একটি মধুর মিনতিতে। আর সাড়ীর

দুটি প্রান্ত অঙ্গ থেকে তার উধাও হোয়ে গেছে কোন্ পৃথিবীতে—যেন কার খুসীর নিমন্ত্রণে হোয়েছে নিঃশেষ।

আর ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল আলোর নীচে সুকুমার দেখলো শুভ্র সুপুষ্ট দুটি উরুর কিছু নীচে বিচলিত হোয়ে আছে অরুণার পেটি কোটের অপর একটি প্রান্ত। আলগোছে একটা হাত রাখলে বাম উরুতে সুকুমার—আর একটা হাতে অরুণার তরঙ্গিত বক্ষের আবেদন থেকে উত্তমাঙ্গের বন্ধনী ধীরে ধীরে মুক্ত কোরে দিলো। মুক্তির স্বাদে, বাতাসের নতুন আমন্ত্রণে অরুণার যুগল স্বর্গ ঝলমল কোরে উঠলো। আর সুকুমার তারি ওপর কান পেতে শুনলো কোনো আদিম সমুদ্রের স্বপ্ন সার্থক হবার এক অবিশ্রান্ত জল কল্লোল।

মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনতেই ঘুম ভেঙে গেল অরুণার। প্রথম বিস্ময় অপনোদিত হোতেই দু' হাতে সে গলাটা জড়িয়ে খুব কাছে টেনে নিয়ে এলো সুকুমারকে :—

—"স্বপ্ন দেখছিলাম তুমি আজ আসোনি, তাই ঘুম ভেঙ্গে গেল। আর ঘুম ভাঙতেই দেখি তুমি। মাই কিসিং ব্যাণ্ডিট—" একটি সূক্ষ্ম হাসির রেখায় উজ্জ্বল হোল অরুণার দুটি অধরের প্রান্ত।

—"ঘুমলে তুমি আরো সুন্দর—তাইতো তোমাকে জাগাতে সাহস পাই না"—অরুণার ঠোট দুটির পরে সুকুমার দিল এঁকে ওর অধরের তৃষিত উত্তাপ।

—"ঘুমিয়ে ছিলাম, সেই সুযোগেই দেখছিলে বুঝি আমার

নিরাবরণ রূপ ? সত্যি এই রাত্রিটুকু আমি কত অসহায়—আমি কত সুন্দর। আমি আহ্বান জানাই পৃথিবীর কাছে আর উৎকর্ণ হোয়ে প্রতীক্ষা করি তোমার পদধ্বনির—"সুকুমারের ঘন চুলের ভেতরে আগুনের শিখার মত আঙ্গুল চালাতে চালাতে বলতে লাগলো অরুণা—"কলেজে যেদিন প্রথম তুমি এলে—আমার দিকে বার বার দৃষ্টি দিতে বলে তোমাকে কতই কি না ভাবতুম। সেদিন কি জানতুম তুমি আমার মনের মানুষ—আমার অভিসারের ভ্রমর। বই এর প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তোমার সঙ্গে পরিচিত হলুম—একেবারে তোমার পাশে এশে দাঁড়ালুম। তারপর একদিন তুমি এলে এই ঘরে সন্ধ্যের সময় কি যেন আমাকে বোঝাতে। মনে পড়ছে আকাশ ভেঙে সেদিন নেমেছিল জ্যোৎস্না আমাদের এই আর্কেডিয়ার অঙ্গে অঙ্গে। তোমার সেদিনের রূপ ভুলবো না কুমার, তুমি তখন সত্যিই ছেলেমানুষ। ভালো যে লাগলো সেদিনের মুহূর্ত্তটি তাই কোনো কিছু না বিবেচনা কোরে তোমাকে একবার হঠাৎ আদর কোরে বসলুম"—বাঁ দিক ফিরে সুকুমারের নিঃশ্বাসের উত্তাপ একটু গ্রহণ কোরে নিলো অরুণা, তারপর আবার বলতে লাগলো—"কী ভয় যে সেদিন হোয়েছিল, তা বলবার নয়। পরদিন ক্লাশে কী কোরে তোমাকে মুখ দেখাবো, সে কথাই ভাবতে লাগলুম। প্রথম পিরিয়ডেই আবার তোমার ক্লাস—সেকথা ভাবলে লজ্জায় এখনো মরে যাই। তিনদিন তোমার পিরিয়ডে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালুম। শুনলুম তুমি অনেক মেয়ের কাছেই আমার খোঁজ

নিচ্ছো। তাতে লজ্জার আর সীমা রইল না। তারপর যেদিন বিনা নিমন্ত্রণে তুমি আমার ঘরে এসে আমাকে পুরস্কার দিয়ে গেলে আমার সৌন্দর্যবোধের, তখন আমি দ্বিতীয়বার মুগ্ধ হলুম। মনে হোল এই না হোলে আবার বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো সুকুমার আর সমস্ত বাড়ীর স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ কোরে রাত বারোটা বাজার শব্দ ভেসে এলো। সুকুমার ছুটি হাতে রজনীগন্ধ্যার মত অরুণার হাল্‌কা সুরভিত নিরাবরণ তনুলতাটি তুলে ধোরলো। তারপর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে অনেকক্ষণ ধোরে কী যেন খুঁজে বেড়ালো সে মুখে।

"কী দেখলে ?—" বিছানার ওপর আবার শোয়াতেই কৌতুহলী হোল অরুণা।

"অনেক কিছু। দেখলুম এমুখ জন্ম-জন্মান্তর থেকে পরিচিত কি-না—"পরিত্যক্ত সাড়ীটা আবার গায়ের সঙ্গে হেসে হেসে জড়াতে থাকে সুকুমার, "হ্যাঃ কালকে কিন্তু ক্লাসে তোমার জন্য কিছু নোটস্‌ নিয়ে আসবো। আর লাইব্রেরী থেকে দুখানা বই আনিয়েছি, একবার পড়ে দেখো—কাজে লাগবে।"

চলে যাবার জন্য উদ্যত হোতেই অরুণা এক দৌড়ে অমনি হাসতে হাসতে দরজার কাছে ছুটে এসে সুকুমারের মুখটী কাছে টেনে নিয়ে বললো চুপি চুপি—

Since nothing is in store for us,
Come let us kiss and part.

—"ইউ নটি গর্ল—" চিবুকটা ডান হাত দিয়ে তিনবার

সামান্য একটু আঘাত কোরে মুখ টিপে হেসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সুকুমার সোম। আর্কেডিয়া কলেজের বাংলা সাহিত্যের তরুণ অধ্যাপক। পিরিয়ড পেপারে এখনো যার রেকর্ড কেউ ভাঙ্‌তে পারলো না।

দরজার কাছে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অরুণা। এতবড় হোষ্টেলের সমস্ত কক্ষ নির্বাক। আর তার ঘরে এখনো আলো জ্বলছে, সে এখনো জেগে রয়েছে একা। এতক্ষণে সুকুমার হয়তো চঞ্চল সিংএর হাতে উজার কোরে মুদ্রা উপহার দিয়ে অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হোয়ে গেছে। আর প্রার্থিত অংশ ভালো কোরে নিরীক্ষণ কোরে আর্কেডিয়া হোষ্টেলের সতর্ক প্রহরীর দৃষ্টি আবার হয়তো ঘুমের আহ্বানে জড়িয়ে এসেছে। তেতলায় সিঁড়ির একপাশে ঘরটি পেয়েছে বলে, অরুণা ভাবলো একবার, তার অভিসার একদিনো ব্যর্থ হোল না। সপ্তাহে দুটি দিন সুকুমারের উপস্থিতির ভিতরে উজ্জ্বল হোয়ে থাকে অরুণা, নিজেকে এই দুটি দিন সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দেয় সে। তাদের ব্যবধান থাকে না আভাষের—আঁধারের আর আবরণের।

কলেজ কম্পাউণ্ডে তাকে ঘিরে রীতিমত গুঞ্জন জাগে। সমস্ত মেয়েদের কাছে অরুণা ভয়ের আর অবহেলার এক অদ্ভুত সামগ্রী। সেটা অরুণা ভাবে মনে মনে—তাদের ইন্‌ফিরিঅরিটি কম্‌প্লেক্স্‌। আর ছেলেদের অনেকের কাছে সে ফ্লার্ট—কারো কারো কাছে আবার জিনিয়স্‌। এই বিচিত্র দৃষ্টিকোণ—এই বহুমুখী তীব্র সমালোচনার জন্য অরুণার জীবনে প্রচ্ছন্ন যেন

কিছুই রইল না। তার নারী হৃদয়ের রহস্য, তার মোহময় আয়ত আঁখির ভাষা—অরুণা মনে মনে একবার হাসলো—এখনি কি সে অনবগুণ্ঠিত হোয়েছে সকলের কাছে। সকলে কি জান্তে পেরেছে অরুণার এই চঞ্চলতা তার ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাশের কোনো অরল্যাণ্ডোর হৃদয় জয়ের অভিলাষে আবেগ-মধুর !

সেদিনো কলেজে পা দিয়ে বহু প্রতিকূল দৃষ্টির উজান ঠেলে সোজা এসে অরুণা ঢুকলো কমনরুমে। তার আবির্ভাবের সংকেত এক মুহূর্তে অমনি সমস্ত মেয়েদের চোখে চোখে জ্বলে উঠলো। আশে-পাশের বেঞ্চিগুলো দেখতে দেখতে হোয়ে গেল ফাঁকা। ঘরের দিগন্তে মধুচক্র স্থাপিত হোল—তার বিষয় হোল অরুণা এবং তার বহুমুখী কৃতিত্ব। অথচ কারো দিকে ফিরলো না অরুণা, এক মনে লিখে যেতে লাগলো পাতার পর পাতা। উত্তাল তরঙ্গ ভেদ কোরে মনোতরণী ভেসে চললো—অথচ আবর্ত জাগলো অসংখ্য। শুধু নীরবতার আঘাতেই সব ব্যর্থ কোরে দিলো অরুণা।

মেয়েদের অসংলগ্ন বহু কথার ভেতরে একটি কথা সেদিন কানে এলো অরুণার। পূজোর ছুটির আগে 'রাজা' নাটকের অভিনয়-আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, আর আসন্ন আনন্দের সেই দিনটিরও বেশী বিলম্ব নেই। কথাটা শুনে কলমটা ক্যাপে বন্ধ কোরে ঠোঁটের ওপরে দুবার আঘাত কোরলো অরুণা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে উদ্যত হোতেই পিছন থেকে একটি মেয়ের কণ্ঠ ভেসে এলো ঃ—

"একটী কথা ছিল তোমার সঙ্গে অরুণা। শুনলে আমরা সাধারণের দল বাধিত হোয়ে যেতাম।—"

এ আহ্বান আঘাতের মতো মনে হোল অরুণার। তবু সংযম-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বোললো ঃ

"ভূমিকা সংক্ষিপ্ত কোরে প্রয়োজনীয়টুকু বোললে আমিও কৃতার্থ হবো।"

অপমানে মেয়েদের মুখ এক নিমেষে আপেলের বনে সূর্যাস্তের মত দেখালো। একটা অব্যক্ত অভিমান সকলের অধরেই গুঞ্জন কোরতে লাগলো।

"শুনেছ—বোধ হয়, এবার পূজোর আগে আমাদের 'রাজা' নাটকের অভিনয় হোচ্ছে—"একটি দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে বোললো অন্য আর একটি মেয়ে, "কাষ্টিং ঠিক হোয়ে গেছে—তোমার সুদর্শনার পার্ট।"

"রাজা কোরছে কে?" অরুণা কয়েক পা আবার পিছিয়ে এলো।

"প্রফেসর সোম—"সম্মিলিত কণ্ঠে যেন সুকুমারের জয়ধ্বনি হোল। অরুণা বেশ বুঝলো—তাদের অভিমানের উৎসটা কোথায়। "আজ থেকে রিহর্সল্ সুরু হোচ্ছে রুম নাম্বার টেনে কলেজ আওয়ারের শেষে। তোমাকে ঠিক সময়ে আসতে হবে, প্রফেসর সোমের নির্দেশ।"

"ধন্যবাদ—" একটি কথার স্ফুলিঙ্গে সমস্ত পরিবেশটি যেন উত্তেজিত কোরে নিষ্ক্রান্ত হোল অরুণা। সেখান থেকে সে

সোজা চলে এলো প্রফেসর সোমের ঘরে। দেখলো সুকুমারের হাতে একটি 'রাজা' নাটকের বই। বুঝলো এরি মধ্যে চাঞ্চল্য জেগেছে সমস্ত কলেজের ছেলে মেয়েদের মনে—আর সাহিত্যের তরুণ অধ্যাপকদের অন্তরে।

"তুমি নাকি রাজার ভূমিকায় নাম্‌ছো ?" নির্জন কক্ষটিতে পা দিয়ে প্রথম অভিনন্দন জানাবার আগে একটু কৌতুহলী হোল অরুণা।

"হ্যা তুমি রাণী হ'বে ব'লে—"হাতের বইটা বন্ধ কোরে ধবধবে দাঁতে হেসে উঠলো সুকুমার।

"যাক্ সে কথা। আমার নোটস্ এনেছ—কই দাও!" কয়েক পা এগিয়ে এলো অরুণা, "বুঝেছি, এবারে মেয়েদের অভিযোগের আর অন্ত থাকবে না। তবু ওদের স্পর্দ্ধা আমি ভাঙ্‌তে চাই কুমার। তুমি দেখো, এ পরীক্ষায় আমি বিজয়িনী হবো। আর, অন্ধকারের লীলা শুধু তোমার এবার শেষ হবে না—এবার সব মেয়েদের মনের অন্ধকার থেকে আমিও আলোতে উদ্ভাসিত হবো। আচ্ছা চলি—ওদিকে ফার্ষ্ট বেল পড়লো। কই আমার নোটস্ দাও," বলতে বলতে খাতাটি নিয়ে ঝড়ের মত মিলিয়ে গেল অরুণা কলরবের সমুদ্রে। আর কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে থেকে সুকুমারও অফিস ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

সেবারের অভিনয়ে সুদর্শনাকে সুন্দরভাবে ফোটালো অরুণা। রবীন্দ্রনাথের এই আধ্যাত্মিক মানসীকে এমন কোরে

আর কেউ রূপায়িত কোরতে পারেনি আর্কেডিয়ার ইতিহাসে। ব্যাল্‌কনি থেকে ঘনঘন হাততালি, আর গ্রীণ রুমের সমস্ত বিদ্রোহিনীদের অকুণ্ঠ অভিবাদন—এই নিয়ে সেবার প্রমাণ কোরলো অরুণা ঃ সে হম্‌বগ নয়—ফ্লার্ট নয়—সে এমনি একটি নারী যে জীবন ভ'রে সুন্দরের পায়ে আত্ম-নিবেদন কোরে নিজের যৌবনকে নিঃশেষ কোরতে চলেছে। সেদিন মন্ত্র-মুগ্ধের মত সমস্ত অডিটোরিঅম্‌ নির্বাক হোয়ে অরুণাকে অভিনন্দন জানালো, আর গরবিনী অরুণা মুখ টিপে হাসতে হাসতে সেদিন কতকি ভাবলো মনে মনে।

একটি গানের সুর তুটি ঠোঁটের ভেতরে গুঞ্জরিত কোরে হষ্টেলে ফিরে এলো অরুণা। আয়নার সাম্‌নে এসে বহির্বাস মুক্ত কোরতে কোরতে ভাবলো—আজকে তার ট্রাম্প্‌, তার অপ্রতিহত যৌবন বন্যার একটি মাত্র ধারা—এই বিজয় গৌরব। সে এখনো আর্কেডিয়ার সমস্ত ছেলেদের স্বপ্নের অভি-সারিকা হোতে পারে—আর অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রতিযোগিতায় যে কোনো মেয়েকে সে আহ্বান কোরতে পারে। নিজের নিরাবরণ অঙ্গে অঙ্গে এই মুহূর্তে সে অনুভব কোরলো সমস্ত আর্কেডিয়ার ছেলেদের দৃষ্টির দীণতা, আর তাদের অস্ফুট কামনার অস্পষ্ট শিহরণ। ভাবলো পুরুষদের এই মানসিক রিক্ততা নিয়েই মেয়েরা আজন্ম রূপবতী।

এই এলোমেলো কল্পনার মাঝখানে হঠাৎ যেন ছন্দ পতন হলো অরুণার। টেবিলের ওপরে চেয়ে দেখলো, তারি নামে

মূর্ছিত হোয়ে আছে একটি এনভেলপ্। আলগোছে তুলে নিলো অরুণা সে আমন্ত্রণ—তারপর বিছানার সঙ্গে অসঙ্গত একটি ভঙ্গীতে ধীরে সুস্থে খুলে ফেললো চিঠিটা। বলাকার দ্রুত পাখার মত চোখ দুটোকে একবার চিঠির কাগজের ওপর চঞ্চল কোরে দিলো অরুণা, তারপর ভাঁজ কোরে খামের ভেতরে আবার রাখলো ঢেকে। অনুপমার চিঠি—যেতে লিখেছে যশিডিতে। চিঠির প্রতিটি অক্ষরে মিনতির অদ্ভুত দীনতা—সঙ্কোচের একটি নম্র মাধুরী। অরুণা অবাক হোয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো।

সে রাত্রেই সেল্ফের ওপর থেকে নীল প্যাড্টা টেনে নিয়ে অরুণা লিখলো অনুপমাকে, সে যাচ্ছে। আজ বৃহস্পতি বার আর রবিবারের ভোরে সে যেন ষ্টেসনে গাড়ী নিয়ে প্রস্তুত হোয়ে থাকে।' লেখা হোয়ে গেলে এক মুহূর্ত আর সে অপব্যয় কোরলো না—শুয়ে পড়লো আলো নিবিয়ে। ঘুমে দুচোখ জড়িয়ে আসছে তার, দিনের সমস্ত স্মৃতি পাণ্ডুর হোয়ে আসছে যেন চোখের সাম্নে।

পরদিন কমন রুমে বসে বেয়ারাকে দিয়ে স্লিপ পাঠালো অরুণা সুকুমারের ক্লাশে। যাবার আগে যেন একবার তার সঙ্গে দেখা কোরে যায়। এতক্ষণে সুকুমারের নজরে এলো আজকে ক্লাশে আসেনি অরুণা। কলেজ আজ বন্ধ হোয়ে যাচ্ছে—তাই মেয়েরা ভাবলো অরুণার উপস্থিতি আজ নিষ্প্রয়োজন। আর কোনো কোনো মেয়ে সমালোচকের চোখে

সুকুমারের মুখের এই ভাবান্তরটি সংশয় সৃষ্টি না কোরে পারলো না।

ছুটির প'রে অরুণা একরাশ বই হাতে কোরে সুকুমারের ঘরে এসে ঢুকলো। অপ্রস্তুত হোয়ে গেল সুকুমার তার আবির্ভাবের এই আকস্মিকতায়। লজ্জিত হোয়ে তাই বললো সুকুমার ঃ—

"আমিতো যাচ্ছিলাম তোমার কাছে—তুমি কেন আবার কষ্ট কোরে এতখানি পথ হেঁটে এলে। হ্যা, যাক্ সে কথা। কী জন্যে ডেকেছিলে ?"

"কাল চলে যাচ্ছি দিদির কাছে। বিকেলের ট্রেণে। তুমিও আবার সঙ্গে যাবে। দিদিই আমার একমাত্র অভি-ভাবিকা—তার সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকা দরকার—"এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বোলে অরুণা একটু বিশ্রাম নিলো। তারপর আবার খুললো ওর স্তব্ধতার আচ্ছাদন, "একটা কথা। তুমি আগে থেকে ষ্টেসনে গিয়ে তুখানা টিকিট কাটবে—পরে আমি ষ্টেসনে তোমার সঙ্গে মিলবো। এখান থেকে এক সঙ্গে যাওয়াটা ভালো দেখায় না। এই নাও টাকা - "বলতে বলতে সুকুমারের খুব কাছে এসে তার ব্লাউজের ভেতর থেকে ব্যাগ বের কোরে তার হাতে গুঁজে দিলো তুটি দশ টাকার নোট। তারপর সেই বইএর বোঝা নিয়ে ধীরে ধীরে কক্ষ-চ্যুত তারকার মতো নিষ্ক্রান্ত হোলো সে ঘর থেকে। সুকুমার শুধু স্তম্ভিতের মত একবার অরুণার চলে যাবার ভংগীটা লক্ষ্য কোরলো। কী করুণ—কী অসহায় সে দৃষ্টি সুকুমারের !

আর সেদিন রাত্রে নিজের ঘরে এসে যে চিঠিটা পেল সুকুমার, সে হাতের লেখা তার কাছে খুবই পরিচিত, আর সে আহ্বান তার জীবনে খুবই স্বাভাবিক। আজ দীর্ঘ পাঁচ বছর ধোরে ঐ একটি ধরণের লেখাই সে দেখে আসছে। তবু কম্পিত আঙ্গুলে খুলে ফেললো চিঠিটা। পড়লো—

কল্যানীয়েষু—

বছরে তোমাকে দু' বার এখানে আমরা আশা করি। কিন্তু আজ গত পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের সে আশা তুমি একটি বারের মতো-ও মেটাও-নি। কারণ আজো জানতে চাই না। তবু তোমার কাছে প্রার্থনা—এখানে একবার তোমার আসা খুবই দরকার—" —'তোমার মা।'

সে রাত্রে উদ্‌ভ্রান্তের মত আকাশ পাতাল ভাবলো সুকুমার। অথচ অন্ধকারের ভিতরে একটি আলোক রেখাও সে আবিষ্কার কোরতে পারলো না।

তিন

প্রতিদিনের মত বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে এলো অনুপমা। খুসীতে আজ ওর মুখটা উজ্জ্বল। এই বিস্তৃত পৃথিবীর অরণ্যের একটিমাত্র কুসুমকে সে চেনে। আশৈশব তার সঙ্গে পরিচিত—সে অরুণা। একটি বিধুর বীণায় ওরা যেন পরস্পর-বিজড়িত দুটি তার। একটির বুকে আঘাত কোরলে তার বেদনা বাজে অন্যটিতে, আর একটি খুসীতে উতরোল হোলে তার কল্লোলে আর একটি হয় মুখর। আজকে রাত্রি ফুরালে প্রভাতের নোতুন আলোর সঙ্গে সঙ্গে অরুণার মুখও প্রতিভাত হবে তার নিস্তরঙ্গ মানসলোকে। সে আসন্ন উচ্ছ্বাসের কথা ভাবতেই পারে না যেন অনুপমা।

নিজের ঘরটিতে এসে স্কুলের পোষাকটা পর্য্যন্ত আজকে বদলালো না। হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো বিছানায়,

তারপর মনের মত একখানি রবীন্দ্র সংগীতের রেকর্ড গ্রামোফোনের সঙ্গে সংযোজিত কোরলো। আর গানের সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মানুষের মত নিজের কণ্ঠ দিলো মুক্ত কোরে। দীর্ঘদিনের পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর আকস্মিক মুক্তির উত্তেজনার মত সে উদাত্ত স্বরে সচকিত হোলো তার ক্ষুদ্র কক্ষ। একটি রেকর্ডই পর পর তিনবার বাজালো অনুপমা। এই উল্লাস—এই মুহূর্তের প্রাণস্পন্দনে—আজ বহুদিন পরে অনুপমা উজ্জ্বল হোয়ে উঠলো। মনে মনে হিসেব কোরে দেখলো তা প্রায় বারো বছরেরও বেশী।

ঠিক সেই মুহূর্তে—অনুপমার এমনি মানসিক সন্ধিক্ষণে বহু যুগের ওপার থেকে যেন নেমে এলো গৌতম। একটা উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুলতায় আচ্ছাদিত ওর সারা মুখ। চোখের ভেতরে ভাসছে নিদারুণ বঞ্চনার কুয়াশা—তবু দুখানি শুষ্ক অধরে তার কী অপূর্ব স্নিগ্ধতা—কী সুন্দর সংকোচ। অনুপমার আয়ত আঁখির পরিধি যেন আরো স্ফীত হোল কিছুটা।

'তুমি?—'বিশ্বাসই কোরতে পারছে না নিজেকে আজ অনুপমা—এই অদ্ভূত মুহূর্তে। তবু একটু সহজ হবার অভিনয় কোরলো। "আজকেও কি রাত্রির মত আশ্রয় নিতে এসেছ না-কি?"

বড় বড় চোখ দুটো তুলে অনুপমার দিকে একবার চাইলো গৌতম। জীবনে এই প্রথম, অনুপমা ভাবলো, হয়তো আজকে একটি অপরিচিত মেয়ের দিকে স্পষ্ট কোরে দৃষ্টি মেলে দিলো গৌতম। তার দৃষ্টিতে এত দীণতা—এমনি বিস্ময়!

"তোমাকে যখন দিদি বোলে ডেকেছি, তোমার পায়ে হাত দিয়ে একবার যখন প্রণাম করেছি, আশা ছিল আমার বিপদের দিনে একমাত্র তোমার কাছ থেকেই সহানুভূতি পাবো। কিন্তু যখন বিপদ এলো ঘনিয়ে—তোমার রসিকতার নির্ঝর এতোটুকু ম্লান হোলনা অনুদি। যাক্, দুঃখ নিয়েই আমার জীবনযাত্রা, তবু প্রাণ ভ'রে একটি দিনো যদি কাঁদতে পার্তুম—এ দুঃখ তবে আমার হয়তো অনেকটা লাঘব হোত—"শেষের দিকে কণ্ঠ ভারী হোয়ে এলো গৌতমের। কিছুক্ষণ সে স্তব্ধ হোয়ে রইলো।

"ছি ভাই; তোমার সম্বন্ধে যদিও কিছু জানিনা, তবু অতবড় অপবাদটী আমায় দিওনা—"গ্রামোফোনের সাউণ্ড বক্সটা হাতের এক ঝটকায় তুলে আন্‌লো অনুপমা! তারপর দ্রুতবেগে এগিয়ে এলো গৌতমের কাছে, "বিশ্বাস করো, তোমার 'দিদি' ব'লে ডাকা শুধু আমায় কাণেই মিষ্টি লেগেছে তা নয়; এ ডাক এ আহ্বান আমার কাছে পরম সম্পদ্ হোয়ে থাক্‌বে গৌতম। কিন্তু আজকে তোমার বল্‌তে হবে—কিসের তোমার এত

অনুপমার সান্নিধ্য ত্যাগ কোরে একটা চেয়ারে এসে বসলো গৌতম। একটা সামান্য আঘাতে তার মুখটি কেন এত অসহায় দেখলো—সে কথাই ভেবে পেলনা অনুপমা।

"হ্যাঃ আজকে আমি সব কথা বলে যাবো তোমাকে। তবু যার গায়ে আগুন লেগেছে অন্য লোকে জল নিয়ে এলেও কি তার জ্বালা বুঝতে পারে? যে ডুবে যাচ্ছে অনুদি—তীরের

থেকে কাঁদলে সে কী বাঁচে ?" ছলছল কোরে উঠলো গৌতমের চোখ দুটো। চোখের পাতার ওপর তার, কার যেন আসন্ন আবির্ভাব আভাসিত হোল।

"বাবা আমার বিহার সেক্রেটারীয়েটের মস্ত বড় চাকুরে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি দু'হাত ভ'রে আনন্দের সুধা পান কোরছেন, আমার দিকে তাঁর দৃষ্টি দেবার এতটুকু তাই সময় নেই। ভাবিনা সেজন্য কিছুমাত্র—কিন্তু আজকেও মনে পড়ে মা'র সেই উপবাস-ক্লিষ্ট রোগ-পাণ্ডুর মুখটির কথা। অথচ বাবার চরিত্রের প্রতি বিশ্বাস তাঁর ছিল কত গভীর!

"আমি তখন মাত্র বারো বছরের। অনেক রাত্রেই বাবা বাড়ী ফিরতেন না, আর আমি সারা রাত মা'র কাছে শুয়ে শুয়ে দেখতুম, সমস্ত চোখ তার ভেসে যাচ্ছে জলে। জিজ্ঞাসা করতে সাহস হোত না, কারণ, বলবার হোলে আপনা থেকেই আমাকে তা জানাতে পারতো। বাবার এই অধ্যায় প্রায় চার বছর ধোরে চললো। এদিকে আমি আস্তে আস্তে বড় হোয়ে উঠলুম। বাবার এই অবিশ্রান্ত অপব্যয়ের প্রতি প্রথম যেদিন প্রতিবাদের ধ্বনি তুললুম—সে পুরস্কারের গৌরব এখনো অঙ্গে অঙ্গে উজ্জ্বল হোয়ে আছে। আমাদের এই নিত্য সংগ্রামের মাঝখানে একদিন একটি বিপদের রেখা এসে পড়লো। দীর্ঘ দু'মাস অর্ধাহার আর অবহেলার কঠিন স্তর অতিক্রম কোরে চিরদিনের মত বাবাকে ক্ষমা কোরে গেল আমার মা।" চোখের জলে রোমালটি ভিজে উঠলো গৌতমের। একটি

মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হোয়ে আবার সে মুখরিত হোয়ে উঠলো।

"শেষ বাধাটি যেদিন নিশ্চিহ্ন হোয়ে গেল, আমাদের ঘরে একটি নোতুন অতিথির আগমন হোল—বাবার কাছে তার নাম মাঝে মাঝে শুনেছি—মিস্ মার্লিন, বাবারই পর্সোনল এ্যাসিষ্টেণ্ট। ঘরে একটি অপরিচিত বিদেশিনীর আবির্ভাবে মন আমার অতিষ্ট হোয়ে উঠলো। তবু মুখ ফুটে কিছু বলবার উপায় ছিল না। একটি দিনের ঘটনা আমার মনে আছে। রাত্রে খাবার পর আমি আমার ঘরে এসে শুয়েছি—এমন সময়ে একদিন আমার বিছানার কাছে এসে উপস্থিত সেই মেয়েটি। আর কোন কথা না বলে হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধোরে আমার মুখে ওর মুখ রেখে বোললো—'মাই ইয়ং প্রিন্স্—মাই সুইট্ ডর্লিং'—আরো কত কি! ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ থরথর কোরে কাঁপতে লাগলো। আমি শেষে এক দৌড়ে চলে এলুম সোজা একেবারে রাস্তায়। উঃ তবু আমার কাঁপুনি যায় না। তারপর থেকে যখনি তার সঙ্গে দেখা হোয়েছে—এমনভাবে আমার দিকে চেয়ে হাসতো—এমন কোরে চোখ দিয়ে ইসারা কোরতো—আমার কি রকম যেন সেদিন মনে হোত। ভারী বিশ্রী লাগতো সে সব। দেখলুম দুদিন অফিসে গেল না অসুখ বলে—আর আমি এ দুটো দিন সমস্ত পাটনা সহরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালুম। বাবার কাণে একদিন উঠলো আমার স্পর্দ্ধার অভিযোগ—আমি নাকি একদিন তার হাতখানা চেপে ধোরেছিলুম। বিশ্বাস করো অনুদি, আমি

একটি দিনের জন্যও তা পা পর্যন্ত স্পর্শ করিনি। আর মেয়েদের গায়ে হাত দেয়া যে অপরাধ—তাও আমি সেদিন প্রথম জানলুম। এর পরে বাড়ীতে থাকা আমার অসম্ভব হোয়ে উঠলো। আমাকে নির্জনে পেলেই রাশি রাশি চকোলেট কিনে দিতো—আর আমি সেগুলো ছুঁতুম না বলে রোজই বাবার কাছে গিয়ে মিথ্যে কোরে আমার নামে লাগাতো; আমি না-কি তার শোবার ঘরে ঢুকেছিলাম—আমি নাকি তাকে বাথ রূমে স্নান কোরতে দেখেছি। বাড়ীর সঙ্গে এর পর থেকে সমস্ত সম্পর্ক আমার ছিন্ন হোয়ে গেল।

"পথে বেরিয়ে ভাবলুম—এখন কি করি। অতবড় লোকের ছেলে হোয়ে আমি লেখা পড়া শিখিনি, আমি মানুষ হোতে পারিনি। চারিদিক যেন অন্ধকার দেখলুম। সাতদিন পথে পথে ঘুরে এমন একটি জায়গায় এসে পড়লুম—তাকে সবাই বলতো—'টেররিষ্ট্স্ ডেন্।' অথচ বাইরে থেকে তার কোনো আভাসই পাওয়া যেত না। সে যাই হোক্—আমি ভাবলুম এই বা মন্দ কি! কিন্তু একদিন যখন শুন্‌লুম আমাকে একটি পিস্তল দিয়ে একটি ব্যাঙ্ক লুট কোরতে হবে দেশের জন্য, আমি ভয়ে তখন কাগজের পাতার মত ক্ষীণ হোয়ে গেলুম। কিন্তু প্রথমকার অকৃত-কার্যতার জন্য হোল আমার তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। নোতুন জীবনের বিচিত্র স্বাদ গ্রহণ কোরে যখন বেরিয়ে এলুম—তখন দেখলুম অনেককেই আমি আর চিনি না। সেই থেকে নিজে দল গঠন কোরে প্রতিজ্ঞা করলুম—অত্যাচারের

বিরুদ্ধে প্রয়োজন হোলে এমনকি সশস্ত্র প্রতিবাদ কোরতে পর্যন্ত পিছ্‌পা হবো না। সেই মহাশপথের পুরস্কার এই যাযাবর বৃত্তি— এই নিদারুণ অবহেলা আর এই সীমাহীন যন্ত্রণা”—এই পর্যন্ত বলে গৌতম স্তব্ধ হোল। দুচোখ দিয়ে তার ইতিমধ্যে নেমেছে সহস্র অশ্রু-রেখা। আর সেই বিবর্ণ মুখের ওপর অসংখ্য বিষণ্ণ প্রতিধ্বনিতে তাকে দেখালো পৃথিবীর সব থেকে ব্যর্থ—সব থেকে অসহায় একটি হতভাগ্য কিশোর। যার জীবনে প্রাচুর্যের বসন্ত ছিল আশৈশব, যার স্বপ্নে পৃথিবীর সমস্ত বাসনা সার্থক হোতে পারতো—সেই উজ্জ্বল-লগ্নে যেন একটি নির্মম নিয়তির আহ্বান এসে তাকে নিষ্প্রভঃ দিগন্তের দিকে পথ চিনিয়ে নিয়ে গেল। সেখানকার প্রকৃতি গৌতমের কাছে এতটুকু পরিচিত নয়, তার বারো বছরের রূপকথার স্বপ্নে একদিনো তাকে কল্পনা করেনি গৌতম।

আর অনুপমা ছলছল চোখে বসে রইল একটি মূর্তিমতী বিষাদের মত। এতবড় আঘাত সমস্ত জীবনে একবারো সে অনুভব কোরেছে কি না, সে খুঁজে পেল না। একটি উনিশ বছরের কিশোরের জীবনে বেদনার এমনি উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ কি কোরে যে সম্ভব হোতে পারে, দুহাতে মুখ ঢেকে সে কথাই শুধু ভাবতে লাগলো অনুপমা। চেনা নেই, জানা নেই একবিন্দু. যার পদধ্বনি হৃদয়ে একটিবারের জন্যও সে অনুভব করেনি— কোথা থেকে সেই অলক্ষ্য অদৃশ্য ধূমকেতু তার জীবনাকাশে উদিত হোয়ে মনের সমস্ত দিগন্ত উজ্জ্বল কোরে দিয়ে গেল।

আর দুঃখ নেই, অনুপমা ভাবলো, আর দুঃখ নেই তার জীবনে। সমস্ত ক্লান্তির মেঘপুঞ্জ আজকে এই মুহূর্তে বৃষ্টি হোয়ে ঝরে গেল তার মন থেকে। প্রাণ ভ'রে একবার সে নিঃশ্বাস নিলো মুক্ত বাতাসের, উজ্জ্বল আলোকের আর অভিনব অনুভূতির। শেষে একবার উঠে দাঁড়িয়ে গৌতমের কোলের ওপর লুটিয়ে পড়লো একটি লাজ-নম্র প্রণতির মত।

আর অনুপমার পিঠের ওপর কাণ পেতে জীবনে প্রথম শুনলো গৌতম—একটি হৃদয়ের স্নিগ্ধতার গোপন আহ্বান। ঝরা বকুলের মত তার মুক্ত-কবরীর সৌরভ সমস্ত মুখে বিচ্ছুরিত হোল তার—আর কৃতজ্ঞতায় দুটি চোখ স্বপ্নের মত জড়িয়ে এলো গৌতমের। অনেকক্ষণ ধোরে বলবার একটি কথাকেও সে আবিষ্কার কোরতে পারলো না।

"তোমার কাছে হেরে গেলাম গৌতম। আমার জীবনে তুমিই প্রথম ফুল ফোটালে ভাই! তুমি আমাকে পাগোল কোরেছ—তুমি আমার দুঃখের দেশের রাজকুমার"—আয়ত সজল দুটি চোখ তুলে গৌতমের মুখের দিকে চেয়ে রইল অনুপমা। সে দৃষ্টির ভাষা নিস্তরঙ্গ আকাশের মত নিরুদ্বেগ—প্রশান্ত সমুদ্রের মত বেদনার পরিধিতে সুগভীর।

"আর তুমি? তুমি আমার কি জানো অনুদি? আমার আলো, আমার আশা, আমার চিরবেদনার সহযাত্রী। তোমার সঙ্গে রিক্ততার ঋতুতে আমার পরিচয়—সমস্ত ফুল ঝরিয়ে আমি যখন সর্বহারা। এমন সময়ে তুমি এলে—আমার আদিগন্ত মন

মরুভূমিতে প্রথম নামলো শ্রাবণের ধারা। আমি ভেসে চললুম তোমার বাঁশীর সুরে—তোমার হৃদয়ের আলোর প্লাবনে—”বলতে বলতে দুহাত দিয়ে অনুপমাকে দাঁড় করালো গৌতম—

“ক্ষমা করো তুমি—যে ভাষায় কথা বলছি আজ—তা হয়ত অসঙ্গত—অন্যায়। তবু মিনতি, তোমার মহত্বে—তোমার উদারতায়—তোমার মমতায় আমি আবার যখন সব ফিরে পেয়েছি অনুদি, তখন তোমাকে যাবার আগে একবার রাঙিয়ে দিয়ে যেতে চাই কথার তুলি দিয়ে। আমাকে নিষেধ কোরো না, আমায় ভুল বুঝোনা তুমি। আমার অফুরন্ত ভাবনার মাঝখানে তোমার কথা ভাববার হয়তো সময় পাই না, কিন্তু সে রাত্রির স্মৃতি, সেই বর্ষণ-মুখর আকাশের অফুরন্ত রিম্‌ঝিমের মাঝখানে তোমার যে মূর্তি আমি দেখছিলুম—তা জীবনে কোনো দিনো ভুলবো না। আমার সমস্ত কাজে, সমস্ত উদ্যমে ঐ ঘটনা টুকুই হোয়ে আছে অনুপ্রেরণার মন্ত্র। তোমার কাছে আজ এসেছি—একদিন এসেছিলুম, আবার হয়তো আর একদিন আসবো। তবু মনে হয় তুমি আমার আপনার দিদি—আমার যুগ যুগান্তরের অসীম শ্রদ্ধার পাত্রী”—।

হাত ধোরে আস্তে আস্তে বিছানার কাছে গৌতমকে নিয়ে এল অনুপমা। একটি কথারও বিনিময় তার যেন আজ সম্ভব হোচ্ছে না। বিস্ময়ের আর একটি আবর্তে আবার পথ হারালো অনুপমা।

“তোমাকে দুঃখ দিয়েছি গৌতম—না জেনে তোমাকে

সেদিন সন্দেহও করেছি। আমি যে মেয়ে ভাই, তাই সেদিন না কোরে উপায় ছিল না। আর তোমাকে দূর থেকে যে চিনে নেবো—এমন যোগ্যতাও তো সেদিন আমার ছিল না। কিন্তু আজ মনে হোচ্ছে, আমার জীবনে তুমি না এলে, তোমার পদচিহ্ন আমার বনানীতে না জাগলে আমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হোয়ে থাক্‌তো। কিছুই পাইনি আমি, তবু তুমি না এলে কোনোদিনো কিছু পেতুম না। তুমি আমার জীবনের সব চেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র”—এক নিঃশ্বাসে বলে গেল অনুপমা। কেঁপে কেঁপে—জড়িয়ে জড়িয়ে কিছুটা।

“কিন্তু সব কথা যে এখনো বলা হয়নি আমার। বাবা সেই মিস্ মার্লিনকে আজ প্রায় বছরখানেক হোল বিয়ে কোরেছেন। অতএব বাড়ী ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাই যদি ঘুরতে ঘুরতে কখনো-সখনো এখানে এসে পড়ি—তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়োনা লক্ষ্মীটি!” অনুপমার হাত দুটি ধোরে আকুল হোয়ে প্রার্থনা জানালো গৌতম—“আজ এসেছি একটা কাজে। আজ রাত্রের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলে যেতে হবে দানাপুরে। সেখানে আমাদের খুব জরুরী বৈঠক। আগামী তিন মাসের কর্মতালিকা নির্ধারিত হবে সেখানে। কিন্তু আজ সমস্ত দিন পেটে কিছু পড়েনি ভাই অনুদি—যা হোক কিছু এনে দাও,”—উনিশ বছরের কিশোরের কণ্ঠ উদ্বেলিত হোল একটি কুণ্ঠিত আবেদনের দীনতায়।

“কী পাগোল ছেলে তুমি গৌতম! এমনভাবে তুমি প্রার্থনা

কোরছো যেন তুমি ভিক্ষুক, আর আমি রাজরাণী। তবু আমার সমস্ত ঐশ্বর্য এই মুহূর্তে তোমায় দান করলুম গৌতম। বলো কী খেতে তুমি সব চেয়ে বেশী ভালোবাসো ?"

"তোমার সকালের রান্নার যা অবশিষ্ট আছে—তার থেকেই একটু দাও অনুদি। সেই আমার সব থেকে প্রিয়"—হেসে হেসে বললো গৌতম।

আর একবার বিস্মিত হোল অনুপমা। এই অদ্ভূত অপূর্ব কিশোরের কাছে বারবার এমন কোরে সে কেন নিস্প্রভঃ হোয়ে যাচ্ছে—তার কোনো রহস্যই সে যেন আবিষ্কার কোরতে পারছে না। শুধু চোখ ভ'রে তার বিস্ময় সঞ্চিত হোয়ে উঠছে।

এক নিঃশ্বাসে খাবারের সবটুকু লুটে পুটে নিঃশেষ কোরে দিলো গৌতম। মনে হোল যেন কোন যুদ্ধযাত্রার এ এক অস্থির প্রস্তুতি। তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে সে উঠে দাঁড়ালো, তারপর হঠাৎ অনুপমার সাড়ীর একটা আঁচল টেনে তার জলে-ভেজা মুখটি মুছতে মুছতে বললো, "আজকে চলি। যাবার আগে শুধু তোমাকে একটা জিনিষ উপহার দিয়ে যেতে চাই। আমার বিশ্বাস তুমি তা ভয়ের জন্য প্রত্যাখ্যান কোরবে না—"

অনুপমার সমস্ত অঙ্গ থর্‌থর্ কোরে কেঁপে উঠলো এক অজানা উল্লাসে। এক আসন্ন-আসঙ্গ লিপ্সার তরঙ্গ স্পন্দিত হোল তার অঙ্গে অঙ্গে—শিরায় শিরায়।

"এই জিনিষটি তোমার কাছে রেখে দাও। দুদিন পর ফিরে এসে আমি নিয়ে যাবো"—বল্‌তে বল্‌তে পকেট থেকে কাগজে

মোড়া একটি ভারী জিনিষ অনুপমার হাতের ভেতরে গুঁজে দিলো গৌতম। তারপর দরজা দিয়ে ঝড়ের মত মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। আর অনুপমা অবাক্ হোয়ে চেয়ে দেখলো সেটা একটা অটোমেটিক্ রিভলবর্। হাতে নিয়েই ছুটে এলো দরজার কাছে। কিন্তু ততক্ষণে হয়তো যশিডির সীমা রেখাও অতিক্রম কোরে গিয়েছে গৌতম। বাইরে শুধু গহন অন্ধকার—যতদূর দৃষ্টি যায় শুধুই আবছা – সবই অস্পষ্ট।

সেরাত্রে বিছানায় শুয়ে প্রাণভরে কাঁদলো অনুপমা যেখানে সহজ অধিকারের বাহু অনায়াসে প্রসারিত কোরতে পারতো গৌতম—যেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিল না—যেখানে সে ছিল সম্রাট, সে সম্ভাবনাকে এমনভাবে দুপায়ে দলিত কোরে গেল গৌতম—সে কথাটাই শুধু রাতভরে ভাবতে লাগলো অনুপমা। আকাশের সমস্ত নক্ষত্র ছিল তার প্রতি উন্মুখ হোয়ে, তরঙ্গে তরঙ্গে অবিশ্রান্ত সুরের ভেতরে তার প্রতি আহ্বান ছিল উজ্জ্বল, আর সে আকাশকে একটি মুহূর্ত্তের জন্য দীপান্বিত কোরে ধূমকেতুর মত নিশ্চিহ্ন হোয়ে গেল গৌতম। ছেলে মানুষ, একবার ভাবলে অনুপমা, ছেলে মানুষই সে। এখনো তার জীবনে বাঁশী বাজেনি যৌবনের। নিজের প্রতি, অনুপমার প্রতি, বুঝি তাই, এমন কোরে অন্ধ গৌতম। আর একটি রাত্রিকে সে উজ্জ্বল কোরে যেতে পারতো—অনুপমার নিঃসঙ্গ বালুচরে আর একটা স্নিগ্ধ পদ-চিহ্ন সে এঁকে দিয়ে যেতে পারতো অনায়াসে।

চার

যশিডিতে যখন এসে ট্রেণ পৌঁছলো রবিবারের আকাশ তখন অস্পষ্ট কুয়াশায় ভোর ভোর। এরি ভেতরে বিহার পরগণার প্রান্তে প্রান্তে অঘ্রাণের আহ্বান ছড়িয়ে দিয়েছে তার আসন্ন শীতের ম্লানিমা। সমস্ত রাত্রির শীতের উত্তাপ আর অস্পষ্ট অরুণোদয়ের আভাষে গাছের চূড়ায় আর ষ্টেসনের ল্যাম্প-পোষ্টে পুঞ্জীভূত হোয়ে আছে নোতুন মেঘের সম্ভাবনা। কোটের কলারটা আরো ভালো কোরে টেনে দিলো অরুণা, তারপর স্নকুমারের হাত ধোরে নেমে পড়লো গাড়ী থেকে। ছোট্ট স্নুইট্ কেসটা নিজের হাতেই রাখলো—আর একটি হাতে স্নকুমারকে টেনে নিয়ে চল্‌লো সোজা গেটের দিকে। তার উজ্জ্বল যৌবনের জলতরঙ্গে সমস্ত ষ্টেসন্‌টি স্পন্দিত হোল—তার কলরবে যেন দীর্ঘ দিন পরে যশিডি ষ্টেসনে বান ডাক্‌লো প্রাণের।

আর গেট পার হোতেই দেখা গেল অনুপমাকে। কে বোলবে সে অরুণার সহোদরা? সুকুমার প্রথম দৃষ্টিতে অনুভব কোরলো আকাশের এমনি অস্পষ্ট আলোকের মতই অনুপমা স্নিগ্ধ। সমস্ত রাত্রির অবিরাম যন্ত্রণার শেষে প্রত্যুষের প্রথম সূর্য্য-প্রসবান্ত আকাশের মত পাণ্ডুর মনে হোল অনুপমাকে তার। সুকুমারের দুটি চোখ এলো বিস্ময়ে ভ'রে।

"পরিচয় করিয়ে দি এঁর সঙ্গে। আমাদের কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক, নাম সুকুমার সোম। চিঠিতে এর কথা লিখতে পারিনি, তার কারণ এঁর আসার কথা ছিল না"—পরে অনুপমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো সুকুমারকে—

"আর ইনি আমার দিদি! এখানকার ভিক্টোরিয়া স্কুলের টীচার, নাম অনুপমা রায়।"

নিরাভরণ হাত দুখানি তুলে সুকুমারকে নমস্কার কোরলো অনুপমা। কঙ্কনের একটা কিঙ্কিনি যদিও তাতে ধ্বনিত হোল না তবু সুকুমারের হৃদয়ে এই অলংকারহীনতার মঞ্জীর কেমন যেন একটী অব্যক্ত ঝংকার দিয়ে উঠলো।

"আমার কী সৌভাগ্য আপনি এসেছেন। কিন্তু অরুণা চিঠিতে আমাকে আভাষই দেয়নি বলে ষ্টেসনে আপনাকে চিনে উঠতে পারিনি—সেজন্য ক্ষমা কোরবেন"—হাসতে হাসতে প্রতীক্ষিত একটী টম্‌টমের দরজা খুলে দিলো অনুপমা। দুজনে না ওঠা পর্য্যন্ত কিছুতেই সে গাড়ীতে উঠলো না।

গাড়ী চল্‌তে লাগলো ষ্টেসন রোড্ দিয়ে। প্রথম পথটুকু

মসৃণ ও মোলায়েম, তারপরেরটুকু রুক্ষ, অসমতল আর বন্ধুর। অসংখ্য অনভ্যস্ত ঝাঁকুনি অরুণার মুখে ফোটালো বিরক্তির রেখা। শুধু সুকুমার পথের দিকে তাকিয়ে সমস্ত পথের শোভাকে নীরবে অনুভব কোরতে লাগলো।

"ও হরিবল্ দিদি—কোচম্যান্‌কে একটু আস্তে চালাতে বল্ না। এই দুঃখেই তো মফঃস্বলে আসি না"—লক্‌লক্ কোরে উঠলো অরুণা আগুনের শিখার মত। পরে সুকুমারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বোললো—"আপনার নিশ্চয় খুব অসুবিধা হোচ্ছে—না সুকুমার বাবু? কী কোরবো বলুন! এদেশের পথঘাট এমনি-ই বিশ্রী! আর দিদিও বেছে বেছে এমন গাড়ী ঠিক কোরেছে যাতে ভদ্রলোকে চড়তে পারে না।"

পথের দিকে চেয়ে অনুপমা হাসলো একবার। গাড়ী চলেছে চাবুক আর ঘণ্টাধ্বনির তালে তালে। এখনো ভালো কোরে ভোর হয়নি যশিডিতে। পথের দুপাশে সদ্য জাগ্রত মানুষের কৌতুহল আর বিরক্তির আভাষ ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। অথচ তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই কোচ্‌ম্যানের। মঙ্কি ক্যাপে সমস্ত মুখটা ঢেকে সে চলেছে পথের ওপর দিয়ে ভৈরবীর একটা রুক্ষ স্রোতকে বহন কোরে। সে প্রভাতের প্রথম শব্দের ভগীরথ।

টমটমে তাদের বেশী কথা হোল না। পথের দৃশ্য দেখতে দেখতে সুকুমার মাঝে মাঝে চুরি কোরে শুধু দেখতে লাগলো অনুপমার বিষণ্ণ পরিবেশ। ধবধবে জ্যাকেটের ওপর সাদা

নিরাভরণ সাড়ীর প্রান্ত প্রতিফলিত হোয়ে চলেছে তার প্রথম উষার অনুরাগ-ভরা দৃষ্টিতে। আর বিমর্ষ শুকতারার স্তিমিত উপস্থিতির মত অনুপমাকে মনে হোল এই বিহার পরগণার রুক্ষ বন্ধুর পথে যেন একটী বিরাট ছন্দপতনের মূর্তিমতী অপরাধ।

স্তব্ধ প্রান্তরের ওপর দিয়ে তাদের যাত্রা অবশেষে রুদ্ধ হোল। তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে অনুপমা খুলে দিল গাড়ীর দরজাটা। সুকুমার লক্ষ্য কোরলো, আবার সেই রাত্রি শেষের জ্যোৎস্নার মত সাদা হাত প্রসারিত কোরে অনুপমা প্রাপ্য পাওনা চুকিয়ে দিলো কোচ্ম্যানের। নিটোল মসৃণ দুটী হাত আর জ্যাকেটের হাতায় সূক্ষ্ম জরির সোণালী কাজ—এমন অপূর্ব সঙ্গতি এর আগে এতবড় কোলকাতা সহরেও যেন দেখেনি সুকুমার।

অনুপমার ঘরটীকে খুবই সাধারণ মনে হোল সুকুমারের। অথচ কী অদ্ভুত সুন্দর লাগলো তার! একদিকে গ্রামোফোন, তিনদিকে ঘিরে রয়েছে তিনটী বেতের চেয়ার। বিছানায় চাদরের শুচিতার সঙ্গে ছড়ানো রয়েছে অনুপমার খোলা চুলের সুরভি। পর্দার হলুদ রংএর প্রতিবিম্ব এসে পড়েছে সমস্ত ঘরটিতে। আর বদ্ধ জানালার ফাঁকে ফাঁকে অরুণোদয়ের আহ্বানের ব্যর্থতায়—বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হোয়ে, অসংখ্য সৌন্দর্য-সমুদ্রের সুধা পান কোরেও আজকে যেন আর একটি প্রচ্ছন্ন দিগন্ত আবিষ্কার কোরতে পারলো সুকুমার। এমন সহজ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য

অনুপমাকে সে মনে মনে জানালো অসংখ্য অভিনন্দন। আর মনে হোল অনুপমা সত্যিকারের আর্টিষ্ট !

স্নানাহারের পর্ব যখন শেষ হোল তাদের, অনুপমা ঘড়ির আওয়াজ উৎকর্ণ হোয়ে শুনলো দশটা। বাথরুম থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে সামান্য একটু প্রসাধনের স্তর অতিক্রম কোরে দরজার কাছে এসে বোললো,—"রুণী, তুই দেখিস সুকুমার বাবুকে। আমার আজকে স্কুল বন্ধ হোয়ে যাচ্ছে। আর চারটের ভেতরেই আমি চলে আসবো। আর সুকুমার বাবু! অত্যন্ত দুঃখিত আমি। আমার ঘরে আপনারা অতিথি, আর সেই আতিথেয়তা দেখাতে আমাকেই কিনা চলে যেতে হোচ্ছে। তবু রুণী রইলো, ও-ই সব দেখা শোনা কোরবে",—সাদা ক্যান্‌ভাসের চটী পায়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল অনুপমা। আর অমনি দরজা বন্ধ কোরে এক লাফে অরুণা উন্নীত হোলো বিছানায় সুকুমারের বাহু-বন্ধনে।

"বাবারে বাবা! প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। কতক্ষণ ধোরে চুপচাপ থাকা যায়"—বোলতে বোলতে সুকুমারের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো অরুণা। আর সুকুমার তাকে আহ্বান কোরে নিলো তার তনুর উত্তাপের ভেতরে—তার তরঙ্গিত বুকের সমুদ্রের মাঝখানে।

অগ্রাণের বিকেল চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ভেসে

আসে বিষণ্ণতার সুর। পথের দুপাশের গাছের পাতায় ঝিরঝির কোরে বাজে তার পুরবী।

জোরে জোরে পা চালালো অনুপমা। কাণের দুপাশ দিয়ে বাতাসের সশব্দ প্রতিবাদ কতবার তার গতি মন্থর কোরে দিতে এলো, এতটুকু ভ্রুক্ষেপ তবু সে কোরলে না। কিন্তু সমস্ত পথ ভ'রে যার কথা ভাবলো, সে অরুণা নয়, সুকুমারো নয়। সে গৌতম। আগের দিন গোধূলিতে যে এসেছিল একটি অপরিচিত গ্রহের মত। এতক্ষণে হয়তো সে দানাপুরের একটি অতি নিশ্চিন্ত পরিবেশে নিস্তব্ধ হোয়ে আছে। সমস্ত দিন পথ হেঁটেছে, হয়তো কোথাও কারো কাছে মুহূর্ত্তের জন্য সে এতটুকু নির্ভর করেনি। ধূলোয় মলিন সেই গেরুয়া রংএর দৃষ্টি, সেই দুটি হাতের কম্প্র নম্রতা—এক অলক্ষ্য সীমান্ত থেকে কল্পনা কোরতে লাগলো অনুপমা। আর কল্পনা কোরে সে ক্লান্ত হোল বহুবার।

অথচ সুকুমারকে একটি অধ্যাপকের বেশী কিছুতেই ভাবতে পারে না অনুপমা। একটি মার্জিত রুচির দীপ্তিতে সুকুমার অত্যন্ত আত্ম-সচেতম। অথচ নিজের পরিধির সীমাও অতিক্রম করার দুঃসাহস সে কল্পনা করে না। সহর সভ্যতায় একটি অনিবার্য পরিণতি যেন সুকুমার। অতীত আর বর্ত্তমানের গৌরবে যে আমরণ উজ্জ্বল।

সমস্ত বিকেল সেদিন অরুণাদের সব ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলো অনুপমা। প্রথমে ওর স্কুল, যার সুখ দুঃখের সঙ্গে তার

জীবনের সুখ দুঃখও অনেকটা জড়িত। স্কুলের শৈশব, কৈশোর এই দুটি স্তরকে সে অতিক্রম কোরতে দেখেছে, যখন অনুপমার সমস্ত যশিডিকে মনে হোত প্রেতপুরী। স্কুল থেকে নিয়ে গেল স্যানাটরিঅমে একটী অনতিউচ্চ পাহাড়ের ওপর অবস্থিত একটী অপুর্ব সুন্দর অট্টালিকা। দূর থেকে শুধু মনে হয় একটী অভিশপ্ত রাজপুরী। কাছে গেলে ভুল ভেঙে যায়, তখন সব কিছুই উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে। সেখান থেকে মিলিটি্র একাডেমী। প্রশস্ত মুক্ত প্রাঙ্গনের ওপর ভারতের ভাবী সৈনিকের জীবনের বিরাট স্বপ্ন সাথক হবার প্রস্তুতি পর্ব—একে একে সব ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলো অনুপমা।

"আজকে আর নয়, কি বলেন সুকুমার বাবু? একদিনে সব কিছু দেখলে এই ছোট্ট জায়গাটীর তবে ভারী দুর্ণাম হবে। ও বেচারা এত অল্পে ফুরিয়ে যেতে প্রস্তুত নয়,"—আঁচলের একটী প্রান্ত আঙ্গুলের সঙ্গে জড়াতে জড়াতে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো অনুপমা।

রোমালে সেদিন দশবারেরও বেশী মুখ মুছলো সুকুমার। আর অরুণা তার সান্ গগ্ল্স্ চোখ থেকে একবারো তুললো না। খুলল না গলায় বাঁধা লাল সিল্কের রোমালটা ভুলেও একটীবার।

"সত্যি, এই ছোট্ট সহরে এমন সৌন্দর্যের সমারোহ দূর থেকে কল্পনাই করা যায় না—অনুপমা দেবী। আমরা সহরের কৃত্রিম রূপ নিয়েই মুগ্ধ। ভাবতেই পারি না ভারতবর্ষের এমন অসংখ্য

অখ্যাত অজ্ঞাত জায়গায় সত্যিকার সৌন্দর্য্য আছে লুকিয়ে। আর সে আবিষ্কারের চোখ থাকা চাই—যা আমাদের বড় বড় সহরের প্রায় কোনো লোকেরই থাকে না”—আর একবার ভাল কোরে রোমালে মুখ মুছতে মুছতে বললো স্নকুমার।

“সত্যি অরুণা—এই ছ্যাখো, এই আমাদের কথাই বলি। দিনে ছুবেলা ট্রামে চেপে কলেজ যাই আসি। আর মাসে বড় জোর এক আধ দিন সিনেমা। ব্যস্ ফুরিয়ে গেল আমাদের সহর দেখা—সহর সম্বন্ধে সমস্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। একদিন ইচ্ছেও করে না গংগার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই সহর ছাড়িয়ে অনেক দূর। কিংবা দল বেঁধে আশে-পাশের গ্রাম থেকে হৈ হৈ করে আসি একদিন”—

“কেন আমাদের কলেজে তো এক্সকর্‌সন্ ট্রিপের এ্যারেঞ্জমেণ্ট রয়েছে। আর একবার আপনিও তো তার ইন্‌চার্জ হোয়েছিলেন”—রোমালের গ্রন্থিটা আরো শক্ত কোরতে কোরতে বোলে উঠলো অরুণা। আর ইসারায় একটা অসংগত ভংগী কোরে একবার মুখ টিপে হাসলো। অনুপমা একবারো তা লক্ষ্য কোরলো না। তার অগ্রগমনের গতি মন্দীভূত হবার কোনো লক্ষণই দেখতে পেল না স্নকুমার।

“ও, তোমাদের সহরের ট্রিপের কথা বাদ দাও অরুণা। ও আমার ভালোই লাগে না। অথচ বেশ লাগছে এই যশিডিকে। চিনি না, জানি না, এতটুকু—অথচ একটি দিনে এমনি পরিচিত হোয়ে গেল, মনে হোচ্ছে বিদায় নেবার সময় কষ্ট হবে”—

একটা সম্মিলিত হাসির তরঙ্গ মুক্ত প্রান্তরের ভিতর উদ্ভাসিত হোল। অরসিক পথচারীদের কাছে তা শুধু পরিপূর্ণ মর্যাদা পেল না।

সে রাত্রেও আবার রেকর্ড বাজালো অনুপমা। রবীন্দ্র সংগীতের নির্বাচিত অতি পরিচিত পুরবীর সুরে রাত্রির বিবর্ণ বুক আবার মুখরিত হোয়ে উঠলো। মুখোমুখী ছুটো বেতের চেয়ারের ভিতরে আকণ্ঠ নিমগ্ন হোয়ে উৎকর্ণ হোয়ে তা শুনলো অরুণা আর সুকুমার। কথার উচ্ছ্বসিত স্রোত এল ছুজনের অধরের প্রান্তে—কিন্তু সুরের এমন স্নিগ্ধ মূর্ছনার সঙ্গে কোনো কথার প্রকাশই যে অসংগত—একথা বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হোয়ে এতটুকু বুঝতে ভুল কোরলো না সুকুমার। আর অরুণা ভেবেই পেল না—কোন কথাটি এই প্রসঙ্গে তার স্মরণীয় হোতে পারে। স্তব্ধতার সমুদ্রে আবার তাই সে সমাহিত হোল মনে মনে।

আর একবার তাদের সাম্‌নে চা রেখে গেল অনুপমা। এত আল্‌গোছে টেবিলের সঙ্গে সে ছোঁয়ালো কাপ ছুটো—এতটুকু তাতে শব্দ হোল না, সংগীতের সুরের প্রবাহে বিন্দুমাত্র তাতে ছন্দপতন হোল না। মন্ত্রমুগ্ধের মত হাতখানি বাড়িয়ে কাপটিকে নীরবে কাছে টেনে নিলো সুকুমার—চুমুকের শব্দ পর্যন্ত তাতে হোল না। আর অরুণার চা ঠাণ্ডা হোয়ে গেল—তবু তার শ্রুতির ধ্যান ভাঙলো না।

জানলা থেকে সরে এসে রেকর্ডটা বদলে দিলো অনুপমা।

এবারে যে রেকর্ডখানি তার হাতে এলো, তার কথাগুলোর ওপর চোখ পড়তেই কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হোয়ে রইলো সে—শেষে সে রেকর্ডটি আর বাজালো না। অন্য আর একটি তার বিনিময়ে গ্রামোফোনের সংঙ্গে সংযোজিত কোরে উঠে এলো জানলার ধারে। পথের দিকে দৃষ্টি মেলে দেখলো, এমনি একটি নির্মম তমসাবৃত রাত্রে একটি কিশোরকে সে ঘর থেকে বিদায় দিয়েছে। আর আজকে তার ঘরে উজ্জ্বল আলোকের সামনে স্থির হোয়ে আছে স্থকুমার। সেদিন অন্ধকারের বুকে একজনের পদধ্বনির কথা ভেবে রাত্রি ভ'রে তার সমস্ত হৃদয় বিধুনিত হোয়েছে। আর আজ তার বিনিময়ে তারই ঘরে একটি অপরিচিত অতিথির পরিচর্যার কথা কল্পনা কোরে মনে মনে ক্লান্ত হোয়ে উঠলো অনুপমা। ভাবলো, এর জন্য কি স্তব্ধ হোয়ে একদিনো সে প্রার্থনা জানিয়েছিল নক্ষত্রের দিকে চেয়ে ?

সুদীর্ঘ স্তব্ধতা প্রথম ভাঙলো অরুণার। চেয়ার ছেড়ে উঠে এলো গ্রামোফোনের সাম্‌নে, তারপর মাঝপথে আচমকা সাউণ্ড বক্সটি তুলে বোললো, "আর ভালো লাগছে না, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে দিদি। কাল সারারাত ট্রেণে একটুও ঘুম হয়নি। আর স্থকুমার বাবু তো সমস্ত পথটা এক রকম প্রায় দাঁড়িয়েই এসেছেন।"

"তাহলেও গানটা শেষ হোতে পারতো অরুণা। তোমার সৌন্দর্য-বোধ দেখছি অল্প—" অরুণার কথার পিঠে পিঠে প্রতিবাদ কোরে উঠলো স্থকুমার। তার চোখের বিচিত্র

ইসারায় পরিস্ফুট হোল অনুশাসনের এক অস্পষ্ট আভাষ। আর ঘুমে জড়ানো চোখ দুটো নিয়ে সে-সংকেত ভালো কোরে লক্ষ্যই কোরলো না অরুণা।

সুকুমারকে সে রাত্রে খাটের সম্পূর্ণ অধিকার দিয়ে দুটি বোন মেঝেতে তাদের শয্যা বিছালো। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল কি যেন ভাবতে লাগলো সুকুমার। ঘুম এলোনা তার চোখে, দুচোখ ভ'রে এলো ব্যর্থতায়···তবু অন্ধকারের দিকে অন্ধের মত সে স্তব্ধ হোয়ে রইলো।

আর রাত্রি যখন একটু গাঢ় হোয়ে এলো, আস্তে আস্তে বিছানার ওপর উঠে বোসলো অরুণা। কুয়াশার মত অন্ধকার সমস্ত ঘরটিতে ছড়ানো। তবু মুখ নীচু কোরে একবার অনুভব কোরে নিলো অনুপমা নিদ্রিত কি না—তারপর আস্তে আস্তে উঠে এলো সুকুমারের শয্যায়। তবু তার উঠবার সামান্য আঘাতেই ঘুম ভেঙে গেল অনুপমার। বিস্ময়-বিহ্বল চোখে স্তব্ধতার জন্য আকুল প্রার্থনা জানালো মনে মনে শুধু অনুপমা।

"কিছুতেই ঘুম আসছিল না কুমার। একেই কাল সারারাত ট্রেণে তোমার সঙ্গে ভালো কোরে কথা বলতে পারিনি—আজকেও সেরকম হোলে আমি পাগোল হোয়ে যেতুম"—সুকুমারের মুখে মুখ রেখে অতি সন্তর্পণে স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ কোরে দিলো অরুণা,—"আচ্ছা! দিদিটা সমস্ত দিন পুলিশের মত ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছে—না? ভয় হোচ্ছিল রাত্রে বুঝিবা আমাকে আঁচলে বেঁধে শোয়।"

"যাই বলো, তোমার দিদি চমৎকার মানুষ। বেশ সাদা-সিদে"—দুহাতে অরুণার গলা জড়িয়ে আরো নিবিড় কোরে তাকে টেনে নিল সুকুমার।

"হ্যাঃ, বেশ একটু বোকা ধরণের! তাই না? যাক্‌গে, এতক্ষণে সে হয়তো স্বপ্ন দেখছে। তা দেখুক! কিন্তু বেশ লাগছে আমাদের এই অভিসার, না কুমার? মনে পড়ছে হোষ্টেলে আমার ঘরে রাত্রে তুমি মেয়ে সেজে আস্‌তে—আর আমি দরজা খুলে তোমার জন্য উৎকণ্ঠিত হোয়ে জেগে থাকতুম। আর এখানে সমস্ত দিন ভ'রে তুমি সুকুমার বাবু—শুধু রাত্রে তুমি কুমার—আমার শয্যা-সাথী",—সুকুমারের বুকের ওপর মুখ ঢেকে আস্তে আস্তে বলে গেল অরুণা। সামনে কোনো মন্দিরের ঘড়িতে ঢং ঢং কোরে বাজলো দুটো। একবার স্তব্ধ হোয়ে সারা মুখে সুকুমারের কি যেন খুঁজে বেড়ালো অরুণা।

"তোমার দিদিকে কথাটা বোলেছ? আশা করি তার অমত হবে না"—আত্ম-বিশ্বাসের তৃপ্তিতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বোললো সুকুমার।

"পাগোল নাকি? কক্ষনো এখন নয়। তুলি চলে গেলে তবে আমি মুখ খুলবো। যদিও ওকে আমি জানি—ওর ভীষণ ইন্‌ফিরিঅরিটি কম্‌প্লেক্স—তবু আমি একবার বল্‌লেই ও কৃতার্থ হোয়ে যাবে। আমার জন্য বেচারা এত করে তবু মন পায় না।" অন্ধকারের বুকে সে হাসিটা যেন আর্ত্তনাদের মত এসে বাজলো অনুপমার বুকে—"আচ্ছা এখন শুতে যাই—আর

যাবার আগে আর একবার তোমাকে আদর কোরে যাই”—বলতে বলতে সে রাত্রির মত সুকুমারের অঙ্গের শেষ উত্তাপ বহন কোরে নীচে নেমে এলো অরুণা। নেমেই একেবারে অনুপমার পাশটিতে এসে নিস্পন্দ হোয়ে রইলো।

আর সমস্ত রাত্রিভরে সেদিন একটুও ঘুমোতে পারলো না অনুপমা। রাত্রির সমস্ত প্রহর একে একে অতিক্রান্ত হোয়ে গেল বহুদূরে—অনুপমা শুধু ছলছল চোখে ভাবলো, ভগবান, কেন এই অবিচার তোমার? আমার জীবন ভ'রে কি চিরদিন এমনিই অন্ধকার থাকবে—রাত্রির আকাশে কী সূর্য দেখা দেবে না কোনদিন? কোথায় আমার গ্রীক দেবতা—কোথায় আমার সেই উনিশ বছরের সর্বহারা রাজকুমার! দেখে যাও, তোমার প্রতিমার অঙ্গে অঙ্গে আজ অনাদরের ধূসরিমা, তোমার ইন্দ্রাণীর কণ্ঠ আজ সহস্র বেদনায় উদ্বেল। কোথায় তুমি, হে আমার স্বপ্ন-শুভ্র সুন্দর দেশের রাজকুমার। এই অন্ধকার—এই নির্মম লগ্ন থেকে শুকতারা হোয়ে আমাকে নবপ্রভাতের কূলে নিয়ে যাও। আমার ঘুম দাও চোখ ভ'রে—রাত্রি ভ'রে।

প্রভাতের অস্পষ্ট আহ্বানে রাত্রির ধ্যান ভাঙলো। বদ্ধ দরজার ফাঁকে শোনা গেল বিহগ-বন্দনা। জানলায়, হলুদ পর্দার গায়ে ঝলমল কোরে উঠলো অরুণিমার সহস্র উচ্ছ্বাস।

স্নান কোরে এসে ষ্টোভ ধরালো অনুপমা। সুকুমার বিছানার ওপর বসে একটির পর একটি সিগ্রেট নিঃশেষ কোরে চললো। আর অরুণা আয়নার সামনে এসে নিজেকে কুঞ্চিত

লক্ষ্য কোরে ভাবলো, হায় অনুপমা রায়, তোমার মত গেঁয়ো মেয়ে ঠিক এমনি কোরেই বনে বনে ফুটে থাকবে। তুমি স্কুলের টিচার! তোমার দৃষ্টিতে, হৃদয়ে আর রুচিতে তুমি সব সময় প্রমাণ করো সে কথা। আর আমি আর্কেডিয়া কলেজের আসন্ন সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী। কলেজে সমস্ত বোকা ছেলেদের আমি মানসী—সমস্ত মেয়েদের আমি ঈর্ষার পাত্রী। তরুণ অধ্যাপকেরা আমার কথায় ওঠে বসে—আর এই যে সুকুমারকে দেখছো—ও আমার তনুতীর্থ-যাত্রী।"

"আজকে আমার স্কুল বন্ধ হবে রুণী। আর ফিরতে আমার ভাই আজ হয়তো একটু দেরী হবে। দেখিস্, সুকুমার বাবু যেন কিছু না মনে করেন"—টেবিলের ওপর চায়ের পেয়ালা দুটো রেখে আঁচলের একটা প্রান্ত আঙ্গুলের সঙ্গে জড়াতে লাগলো অনুপমা।

"তাতে কি—অরুণাই তো রইলো। ও-ই সব দেখবে শুনবে"—আর একটি সিগ্রেট থেকে পর পর কয়েকটি টান দিলো সুকুমার।

"আমি? ওরে বাবা! গিন্নিপণাতে আমার ভারী আপত্তি দিদি। ও কথা আমি ভাবতেই পারি না। কোমরে আঁচল জড়িয়ে সমস্ত কাপড়ে হলুদ মাখিয়ে, এক বুক ঘোম্‌টা দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো—ওরে বাবা! সে আমি কল্পনাও কোরতে পারি না।"

"তার থেকে বলো সহরের আউটস্কার্টে দল বেঁধে একটা

হলিডে-ট্রিপ ! ট্রাক বোঝাই কোরে যেতে যেতে বেশ সমস্ত পথে মিউজিক ছড়াতে ছড়াতে যাবো। ওতে থ্রিল আছে, আছে রোম্যান্স্"—ডান হাত দিয়ে চুলের বিনুনী খুলতে খুলতে বললো অরুণা। আর গর্বে ওর সমস্ত মুখের রক্তিমা উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠলো।

"বেশ লাগে কিন্তু আমার। সন্ধ্যের সময় যখন দেখি গলায় আঁচল জড়িয়ে তুলসী তলায় বাংলা দেশের সব মেয়েরা প্রদীপের সাম্‌নে প্রণতি জানাচ্ছে, আর তাদের প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় সমস্ত বুকটি দুলে দুলে উঠছে—বেশ লাগে কিন্তু আমার"—কুকারে রান্নার আয়োজন কোরতে কোরতে বাংলা দেশের দূর গ্রামের একটি অস্পষ্ট উজ্জ্বল স্মৃতি সকলের সাম্‌নে ছড়িয়ে দিলো অনুপমা।

"ট্র্যাস্। ওই বোকা মেয়ের দল জীবনের কি বোঝে ? কি জানে ? খালি পায়ে লাল সেমিজে আর মোটা সাড়ীতে সমস্ত গ্রামটাকেই ভাবে তাদের পৃথিবী। পুয়োর উইমেন্! না দেখলো একটা ব্যালেট ডান্স্; না অনুভব কোরলো প্লেনে কন্টিনেণ্ট টুর করার কোনো স্বপ্ন-শিহরণ"—অরুণাকে যেন কিছুটা উত্তেজিত হবার মতই দেখালো। লব্ধ অভিমানে সে আয়না ছেড়ে উঠে এল জানলায়।

"ভাবতেই পারি না, চৈত্রের শেষে আমের নোতুন মঞ্জরীতে সমস্ত বনভূমি আলোকিত হোয়ে আছে, কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে রক্তরাগ, ঘনপল্লব ভেদ কোরে কোকিলের কুহুতান, আর দূরের

নদী থেকে ভেসে-আসা স্নিগ্ধ হাওয়ায় সমস্ত পল্লীবালার মাথার চুল দুলে দুলে উঠছে—ভাবতেই পারি না আমি সে দৃশ্য”—পরিত্যক্ত কাপগুলো সংগ্রহ কোরে হাসতে হাসতে ভেতরে চলে গেল অনুপমা।

সে রাত্রে তাদের সৌন্দর্য-তত্ত্ব আর বিশ্লেষিত হোল না।

পরদিন স্কুলে একটি পিরিঅড ও সম্পূর্ণ হোল না, শুধু মেয়েদের কলরবে দীর্ঘদিন বিশ্রামের আসন্ন আনন্দ আভাষিত হোল। কী ভালোই যে লাগলো আজ অনুপমার এই স্কুলটিকে। এই প্রাণ প্রাচুর্য, এমন অবারিত হৃদয়ের উল্লাস—আজ যেন ভিক্টোরিয়ার সমস্ত দিগন্তে বিচ্ছুরিত হোল। অথচ অনুপমা ভাবলো—এখনি তা বলে বাড়ী ফিরে যাওয়া যায় না। দুটি মেয়ের হাত ধোরে কি যেন একটু ভেবে সোজা সে সেক্রেটারীর বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো। ভাবলো, সমস্ত দুপুরটা সেখানে কাটিয়ে বিকেলের প্রান্তে বাড়ী পৌঁছনো যাবে। সেই ভালো, সেই ভারী সুন্দর!

যশিডিতে সব থেকে পরিচিত ডাক্তার সোমনাথ বাবু ভিক্টোরিয়া স্কুলের সেক্রেটারী। পঞ্চাশের প্রান্তে তিনি অবস্থিত—নিঃসন্তান! কথায়, ব্যবহারে আর পোষাকে তার রুচির সুস্পষ্ট ছাপ। নিরহঙ্কার—নিরভিমান পুরুষ তিনি। শোনা যায় যশিডিতে সর্বপ্রথম তিনিই নাকি বৃহত্তর জগতের সভ্যতার বার্ত্তা বহন কোরে এনেছিলেন। তিনি রুচি প্রবাহের

ভগীরথ। আর অদ্ভূত মানুষ তার স্ত্রী—শ্যামলী। কাছে এলেও বোঝবার উপায় নেই, অন্তরে তার দিনরাত্রি যে আগুণ জ্বলছে—কেমন কোরে তাকে তিনি প্রচ্ছন্ন রেখেছেন স্নিগ্ধতা দিয়ে—মধুর ব্যবহার দিয়ে। এক এক সময় অনুপমা অবাক্ হোয়ে যায় ভেবে, যশিডিতে এই সুখী পরিবারটি না থাক্লে কেমন কোরে এই বিদেশে সে একা থাকতে পারতো। আর কেমন কোরেই বা এই দুটী ফুল এক সঙ্গে এসে মিলিত হোল।

বাড়ীতে ঢুকে অনুপমা সোজা চলে এলো অন্দর মহলে—শ্যামলীর কাছে। এ বাড়ীতে তার অবাধ অধিকার। সময়ের প্রশ্ন নেই, সঙ্গতির নেই কোনো অসঙ্গত অভিযোগ। হৃদয়ের পরিচয়ে যেখানে মানুষ সহজ, অধিকারের কোনো প্রশ্নই সেখানে সঙ্গত নয়।

"বৌদি—ও শ্যামলী বৌদি, ভেতরে আস্তে পারি কি ?" দরজার বাইরে থেকে হেসে উঠলো অনুপমা।

"আরে কে—অনুপমা! এসো এসো। উঃ কতদিন পরে এলি ভাই"—বিছানা ছেড়ে চলে এলো শ্যামলী সোজা অনুপমার কাছে। হাত ধোরে তাকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললে, "কিন্তু ভাই এ বুড়ো বয়সে আমাকে আর শ্যামলী বলে ডাকিস্ না। ও নাম আমাকে আর মানায় না।"

"আমি কিন্তু প্রতিবাদ কোরবো অনু। আমার অমন সুন্দর দেয়া নামটার যেন না অপব্যয় হয়। ডাক্তার হোলে কি হবে—সাহিত্য-রসিক আমিও তোমার চেয়ে বড় কম নই অনু। কই,

এসোতো রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতার তর্ক নিয়ে”—বিছানার ওপর ধীরে ধীরে উঠে বসলেন সোমনাথ। তার হাসিতে শ্বেত চন্দনের সৌরভ যেন বিচ্ছুরিত হোল। সে হাসিতে যোগ দিলো শ্যামলী আর অনুপমা।

“ছুটী হোয়ে গেল আজ থেকে। তাই ভাবলুম যাবার সময় একটু বিরক্ত করে যাই। অনেকদিন তো আসা হয় না”—বিছানার একপাশে বোসতে বোসতে বলে অনুপমা।

“ও ছুটী না হোলে বুঝি আসতে নেই। বেশ, তবে আমি এবার থেকে সমস্ত বছর স্কুল বন্ধ রাখবো তোমার জন্য”—অর্দ্ধ সমাপ্ত বইটা আবার হাতের ভেতরে টেনে নিলেন সোমনাথ।

প্রাণ খুলে হাসলো অনুপমা। মনে হোল তার দীর্ঘ পাঁচ বছরের ভেতরে এমন হাসি যেন কোনোদিনো সে হাসেনি। অথচ দীর্ঘদিন ধোরে এই পরিবারটীর সঙ্গে সে পরিচিত। সুখে দুঃখে একমাত্র এদের কাছেই স্নেহ প্রত্যাশা কোরেছে অনুপমা। আর সে স্বপ্ন তার একটী দিনের জন্যও ব্যর্থ হয়নি। সোমনাথের ব্যক্তিত্বে, শ্যামলীর মমতায় বারবার বিস্মিত হোয়েছে সে। মনে পড়ে সে সব দিনের কথা। প্রথম যেদিন সে চাকরী নিয়ে এলো, এই নির্বান্ধব শূণ্য পুরীতে। স্কুলে যাবার পথে তার পিছনে বিচিত্র ইংগিতের ছায়া দুদিনেই সে অনুভব কোরলো। অতিষ্ট হোয়ে উঠলো মনে মনে অনুপমা। একদিন সোমনাথকে খুলে বোললো সব কথা। ব্যস্, সমস্ত যশিডির তরুণের দল অবনত হোয়ে তার কাছে শপথ কোরলো—অপরাধীকে

আবিষ্কার কোরে তার পায়ে এনে উপহার দেওয়া হবে। সেকথা ভাবতেও আজ ভালো লাগে অনুপমার।

বিচিত্র আলাপের স্তর অতিক্রম কোরে বিকেলের মুখ দেখলো অনুপমা। আকাশের গায়ে ঝলমল কোরে উঠলো সবিতার শেষ সমারোহ। অনুপমা চা খেয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হোল।

"চলো তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি"—ষ্টেথিসকোপটা গলার সঙ্গে জড়াতে জড়াতে বললেন সোমনাথ।

"আপনি আর কষ্ট কোরবেন কেন—আমি একলাই যেতে পারবো"—অনুপমা হাসতে হাসতে উত্তর দিল।

"আবার আসিস্ ভাই একদিন। তোকে না দেখে যে থাকতে পারি না"—দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলো শ্যামলী।

হেসে বিদায় নিলো অনুপমা। দুজনে একসঙ্গে পথ চলতে লাগলো। মাঝে মাঝে হোল শুধু টুকরো কথার বিনিময়। তারপর ডিসপেন্সারীর পথে চলে গেলেন সোমনাথ, আর অনুপমা খুসীতে উচ্ছ্বসিত হোয়ে অনেক কথা ভাবতে ভাবতে যখন চলে এলো তার বাড়ীর সামনে—বিকেল তখনো প্রায় নিঃশেষ হোয়ে যায়নি একেবারে।

কিন্তু ঘরের দরজায় পা দিতেই স্তম্ভিত হোয়ে গেল অনুপমা। পাষাণের মত নির্বাক হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে অরুণা আর সুকুমার। দুচোখে তাদের জ্বলছে যেন বিরাট অভিযোগের আগুণ। আর অরুণার দিকেতো চাইতেই পারলো না অনুপমা।

"দিদি, তোমার এখানে কারা কারা আসে বলোতো?" অরুণার কণ্ঠ যেন অভিমানে অস্বাভাবিক গম্ভীর শোনালো।

"কেন? কে এসেছিল এখানে?" ঘরে না ঢুকেই তার বিস্ময়-ভরা চোখ দুটো তুলে জিজ্ঞাসা কোরলো অনুপমা।

"তা জানি না। তবে মনে হোল একটা লোফার। মাথায় একরাশ চুল, পাঞ্জাবীর বোতাম খোলা, পায়ে একটা ছেঁড়া কাব্‌লী—ডিস্‌গ্রেসফুল!" সমস্ত মুখটি কুঞ্চিত কোরে আনলো অনুপমা বিরক্তিতে, "বলে কি না অনুদি কোথায়? যত বলি কি দরকার তার—অমনি দুহাতে আমাকে সরিয়ে দিয়ে বলে—সে আপনি বুঝবেন না। তার কাছে আমার একটা সাংঘাতিক জিনিষ রয়েছে। আরো কতকী! বললো—কে তার বাবার না কার যেন খুব অসুখ, অসুধ কিনে আসবার সময় আবার এখানে আসবে তোমার কাছে। তোমাকে তিনি থাকতে বলেছেন"—'তুমি' সম্বোধনটা ভালো কোরেই লক্ষ্য কোরলো অনুপমা।

"হ্যাঃ এ সব আন্‌ডিজায়ারেবল্‌দের বাড়ীতে না ঢুকতে দেয়াই ভালো। কখন কি হয় তা কে বল্‌তে পারে! আর তাছাড়া আপনি একা থাকেন এই বিদেশ বিভূঁয়ে—তাতে আপনার বিপদও তো হোতে পারে"—একটী দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বোললো সুকুমার। উপদেশের মত কিছুটা শোনালো তা।

"চলুন সুকুমার বাবু। আমরা একটু বেড়িয়ে আসি। সেই স্কাউণ্ড্রেলটার সঙ্গে চীৎকার কোরে প্রায় মাথা খারাপ হোয়ে

গিয়েছে”—পথের দিকে একটী পা বাড়িয়ে দিলো অরুণা। তারপর আবার পিছন ফিরে এসে বললো”—হ্যাঃ আচ্ছা কোরে শুনিয়ে দিয়েছি সেই এক ফোঁটা ছেলেটাকে। যত বলি অনুদি কে হয় তোমার—বলে কি না—বন্ধু, দিদি, সব—সে আপনি বুঝবেন না। আচ্ছা, এখন একবার ঘুরতে যাচ্ছি তুমি বরং একটু সাবধানে থেকো।”

অন্ধকারে দুটি মুর্তি মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। অনুপমা পাষাণের মত দাড়িয়ে রইল দরজার পাশে। অন্ধকার ঘন হোয়ে নামছে যশিডির রুক্ষ আকাশ থেকে—কলরবের কোনও চিহ্নই খুঁজে পাচ্ছে না অনুপমা—ভাবনার কোনো কিছুই আবিষ্কার কোরতে পারছে না সে হাতের কাছে। যে এসেছিল, সেকী আর আস্‌বে? একটু আগে যার চঞ্চল চরণ, যার উদ্‌ভ্রান্ত আঁখি একটি মুহূর্তের জন্য স্থির হোয়েছিল তার দরজার পাশে—হে ভগবান, সেকি ভুল কোরেও আর একবার আসবে না, আর একবারো কি তার অস্থির পদধ্বনি শুনতে পাবো না এই স্তম্ভিত হৃদয়-সমুদ্রের তীরে!

আর ঠিক এমনি সময়ে যেন স্বপ্নের মত এসে উদিত হোল গৌতম। চোখে মুখে তার অস্থিরতা, পা দুটি কাঁপছে শীর্ণ লতার মত। ডান হাতে কয়েকটা অসুধের শিশি।

“দিদি, দিদি তোমাকে খবর দিতে এলুম। সময় নেই, এক্ষুনি ছুটতে হবে। বাবার ভীষণ অসুখ—বোধ হয় আর

বাঁচবেন না”—অস্থিরতায় টলমল কোরে উঠলো গৌতম। “কিন্তু ওরা কে·—ওদের তো চিনি না?”

“যেই হোক্—তুমি কেন ওদের গায়ে হাত দিতে গেলে? ওরা আমার অতিথি—জানো, ওদের অপমান কোরলে আমার গায়ে তা লাগে”—দুহাত দিয়ে সমস্ত অন্তরের স্পন্দনকে আচ্ছন্ন কোরে বোললো অনুপমা।

“কিন্তু আমাকে যে ওরা ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছিল না। আর ঐ মেয়েটি কেন আমাকে তার পায়ের স্যাণ্ডাল খুলে মারলো?” অনুপমার বুকের ওপর মুখ লুকিয়ে অশ্রু-সজল-কণ্ঠে বোললো গৌতম।

“বেশ কোরবে মারবে—কিন্তু কেন তুমি গায়ে হাত দিতে গেলে?” বিরক্তির ভ'রে গৌতমের মুখটা দুহাতে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে চলে এলো অনুপমা। অস্বাভাবিক অভিনয়ের জন্য নিজেকেই তার কেমন যেন মনে হোতে লাগলো। তবু অভিমানের ভাণ কোরে সে মুখ ঘুরিয়ে রইল দাঁড়িয়ে।

“বেশ, তবে আর আস্‌বো না”—গৌতম আর দাঁড়ালো না এক মুহূর্ত। ছুটে গেল অন্ধকারে, স্তব্ধতার অতল সমুদ্রে।

“গৌতম—গৌতম”—বিদ্যুৎগতিতে দরজার কাছে ছুটে এসে দুবার চীৎকার কোরে সমস্ত প্রান্তরকে স্পন্দিত কোরলো অনুপমা। দূর অন্ধকারে শুধু তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল ব্যর্থতার।

সে রাত্রেও ঘুম এলোনা অনুপমার। চোখের জলে তার

বালিশ ভিজে গেল—আঁচল ভিজে গেল—সর্বাঙ্গ প্লাবিত হোল অবারিত অশ্রুধারায়। পাগোলের মত ভাবলো অনুপমা, গৌতম শুধু তার মুখের কথাতেই বিশ্বাস করে গেল। বুঝলোনা তার হৃদয়ের আর্তনাদ, শুনলোনা তার আকাশ-ফাটা ক্রন্দন। সামান্য একটা অনুযোগের অভিনয়ই অনুপমার কাছে সব চেয়ে বড় অপরাধ হোয়ে রইল! এমন ছেলে মানুষ গৌতম!

পরের দিন বিকেলে সুকুমারের চলে যাওয়া স্থির হোল। অরুণা সমস্ত দিন রইলো তার কাছে কাছে। একটুও নড়লোনা কোথাও। সুকুমার একবার ভাবলো—এ অরুণার কিছুটা বাড়াবাড়ি, অথচ মুখ ফুটে কোনো কথাই বলা হোল না তার। অরুণাকে সে চেনে—দীর্ঘদিন ধোরে তার উচ্ছ্বাস তার অভি-মানের সঙ্গে সে পরিচিত। তাই আজ কিছুটা অসংগতি আবিষ্কার কোরেও সে চুপ কোরে রইলো। তবু অনুপমাকে এখনো তার বোঝা হোল না। এই তিনদিন কাছে এসেছে, কতবার তার সঙ্গে কথা বলেছে—অথচ আজ যাবার বেলায় তবু কেন মনে হোচ্ছে তার এসব কথা। মন যেন বলছে এই যশিডিতে না এলে সত্যিকারের সৌন্দর্য যেন কোনো দিনো সে আবিষ্কার কোরতে পারতো না। এর আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে অনুপমার স্নিগ্ধতা—তার হৃদয়ের রিক্ততার উচ্ছ্বাস। অবাক হোয়ে গেল ভেবে সুকুমার, একদিনো সে অনুপমাকে হাসতে ছাখেনি প্রাণখুলে। আশ্চর্য! অদ্ভুত মেয়ে এই অনুপমা। অদ্ভুত ওর প্রতিটি মুহূর্ত!

বিকেলে সুকুমারের যাবার সময় এগিয়ে এলো। উঠোনে টমটম এসে দাঁড়ালো, সুকুমার হাত তুলে অনুপমাকে নমস্কার কোরে এসে তাতে বোসলো। অরুণা গাড়ীতে উঠেই দরজা দিলো বন্ধ কোরে। গাড়ী চলতে লাগলো লাফিয়ে, ডিঙ্গিয়ে কখনো বা খুঁড়িয়ে।

"কোলকাতায় গিয়েই তুমি সব ঠিক কোরে ফেলবে—যেমন যেমন বলেছি। আমি এখানে কটা দিন দিদির কাছে থাকবো, তারপর ফিরে আসবো কোলকাতায়। আমার ইচ্ছে শুভ কাজটা আমাদের যেন খুব শীঘ্রি সম্পন্ন হয়"—গাড়ীতে বসে প্রথম স্তব্ধতা বিদীর্ণ কোরলো অরুণা।

"আর আমার ইচ্ছেটা তোমার আরো আগে হোলেই ভালো হয়। আমি বলছি, এই অঘ্রাণ মাসেই তোমার দিদির কাছ থেকে মত নিয়ে নাও। বিলম্বে বহু বিঘ্ন"—সুকুমার আরো কিছুটা স'রে এলো অরুণার কাছে। তার উত্তাপের আবর্তে।

"দিদির আবার মত কি? আমি বোললেই ওর যথেষ্ট! কিন্তু আমি ভাবছি, বিয়ের পর আমার আর কলেজে পড়া চলবে না। মেয়েরা কি মনে কোরবে?" সুকুমারের সার্টের কলারটা ঠিক কোরে ভাঁজ কোরতে কোরতে বললো অরুণা, "ওরা ভাববে ওদের স্বপ্নের ভিড় ভেঙ্গে তোমাকে আমি শেষ পর্যন্ত জয় কোরে নিলুম বলে সমস্ত অপরাধটাই আমার।"

বিনিময়ে একবার মৃদু হাসলো সুকুমার। সে হাসিতে যেন প্রকাশ পেল তার সৌভাগ্যের স্তিমিত উচ্ছ্বাস।

"ভালোই তো—অতগুলো মেয়ের ভেতরে সবাই জানবে শুধু একটিই আমি বেছে নিয়েছি, আর সেই আমার সত্যিকারের ড্রিম গর্ল।" অরুণার চিবুকটা সামান্য একটু স্পর্শ কোরে হেসে উঠলো সুকুমার।

"তার জন্য কি তোমার পড়া বন্ধ হোয়ে যাবে? কেন? বিয়ের পর আজকাল মেয়েরাই তো কলেজে ভিড় কোরছে। আর তাছাড়া সমস্ত দুপুর থাকবো কলেজে—তোমার বাড়ীতে কি মন টিকবে?"

"না, ঠাট্টা নয় কুমার। তুমি মোটেই সিরিঅস্ নও। মেয়েদের সাম্‌নে তখন বার হোতেই আমার ভীষণ লজ্জা কোরবে।" মুখের কাছে মুখ এনে কণ্ঠের কিছুটা অভিমান সুকুমারকে উপহার দিলো অরুণা।

"বেশ তুমি না হয় দুপুর বেলায় কোনো একটা মেয়ে স্কুলে কাজ-টাজ নিয়ো।" একটা সিগ্রেট ধরালো সুকুমার।

"মাষ্টারী? ও কাজটা আমার দ্বারা হবে না। দেখলে না দিদিকে? যৌবনে যোগিনী সেজে আত্ম-ত্যাগের মন্ত্র ছড়াচ্ছে। হোপলেস্! তুমি আমাকে কি দিদির মত বোকা মনে করো নাকি?" মুখের থেকে সুকুমারের সিগ্রেটটা টেনে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো অরুণা। বেশ বোঝা গেল অভিমানের উৎসটা কোথায়—কোথায় ওর অপমানের কাঁটাটা এসে বিঁধেছে। আর সুকুমার ভাবলো, একবার অরুণাকে বলে, দিদির মতই বোকা হবার সাধনাই যেন ও একটু করে।

ষ্টেসনে এসে দেখলো গাড়ী দাঁড়িয়ে। অথচ ছাড়তে এখনো প্রায় আধ ঘণ্টা। প্লাটফর্মে বারকতক ঘুরে বেড়ালো ওরা। মাঝে মাঝে হোল কথার টুক্‌রো বৃষ্টি। এলোমেলো কখনো বা অসঙ্গত। শেষে একবার হাত ঘড়ির দিকে চাইলো সুকুমার। দেখলো, সময় অনেকখানিই অতিক্রান্ত হোয়েছে কথার পাখায়।

গাড়ীতে বসে মুখ বাড়িয়ে দিলো সুকুমার। আর অরুণা যতখানি পারলো এগিয়ে এলো তার কাছে। তাদের মাঝখানের ব্যবধান সেদিন অনেকের কাছেই দৃষ্টিকটু বলে মনে হোল।

"মনে থাকে যেন কোলকাতায় গিয়েই চিঠি লিখবে।" দ্বিতীয়বার স্মরণ করিয়ে দিল অরুণা।

"হ্যাঃ নিশ্চয় মনে থাক্‌বে। আর তুমি দিদির কাছ থেকে মত নিয়েই আমাকে লিখবে। না হোলে কোলকাতায় উৎকণ্ঠায় আমার দিন কাটবে না। আচ্ছা—বাই-বাই।" সুকুমার একটা হাত তুলে অভিনন্দন জানালো।

গাড়ী চলে গেল সাপের মত এঁকে বেঁকে বহুদূরে। যতদূর দৃষ্টি যায় অরুণা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। তারপর সব অস্পষ্ট হোতেই বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো।

রাত্রে ঘুমোবার সময় সব কথা খুলে বোললো অরুণা। অনুপমা তাতে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হোল না। ও যেন আগেই জানতো এমনিভাবে সহজ হোয়ে নিজেকে অরুণার কাছে মেলে দিলো।

"বেশ তো—এতো আমাদের মস্ত সৌভাগ্য। সুকুমার বাবুর মত ছেলে—ভদ্র অমায়িক তার ওপরে অধ্যাপক। আমার ভয় হোচ্ছে রুণী অমন ভাগ্য কি তোর শেষ পর্যন্ত হবে?"—পাশ ফিরে বোল্‌লো অনুপমা।

"উনি রাজী আছেন দিদি—তোর কিচ্ছু ভয় নাই। ষ্টেসনে আমাকে বারবার বোলেছেন তোর কাছে মত নিয়ে চিঠি লিখতে। বোলেছেন তোমার দিদির কিছুমাত্র আপত্তি থাকলে সমস্ত উৎসাহ আমাদের পণ্ড হোয়ে যাবে"—অন্ধকারের বুকে হাসির শব্দটা ফুটে উঠলো অরুণার, "তোকে যে কি চোখে উনি দেখেছেন তা আর বলবার নয়। তুই বুদ্ধিমান, তুই অদ্ভুত—আরো ছাই কত কি! যত বলি এ আর আপনি আমাকে কি শোনাচ্ছেন নোতুন কথা, ততই বলেন, না না অরুণা তোমার দিদি একটি জিনিয়স।"

অন্ধকারে মুখ টিপে একবার হাসলো অনুপমা। সে হাসি সীমাহীন রিক্ততার আর সর্ব্বস্ব হারাণোর। ভেবেই পেলোনা অরুণাকে আজ কি বোলে সে আশীর্ব্বাদ কোরবে। এমন অকুণ্ঠ প্রশংসার বাণী আজ যে বহন কোরে আনলো তার অনুর্ব্বর মন-প্রান্তে—তাকে আজ কেমন কোরে সে অভিনন্দিত কোরবে? অথচ ভাবলো অরুণার চোখে এখনো সে একটি বোকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পাঁচ

আর উদভ্রান্তের মত যখন পাটনার অভিজাত পল্লীর একটি সুরুচিসম্মত অট্টালিকার দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হোল গৌতম—রাত্রি তখন নিশ্চিহ্ন হোয়ে গেছে সমুদ্রের গর্ভে। সকালের আলো বাতাসে ঝল্‌মল্ কোরছে সমস্ত পাটনা সহর—পথে অসংখ্য যানবাহন আর নরনারীর বিচিত্র কলরব। অথচ এই বাড়ীটি যেন আজ নিঝুম—কেন যেন নির্বাক। শব্দের কিছুমাত্র আভাষ নেই কোনদিকে। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে কি তবে চিনতে ভুল কোরলো গৌতম? অথচ সেই সোণালী লতার ভিতরে আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা 'হালদার লজ' এখনো উজ্জ্বল—এখনো তার কাছে অতি পরিচিত। সেই দুদিকের দুটো বাষ্টের নীচে কৃত্রিম ঝর্ণাটা এখনো ঝিরঝির কোরে বইছে। কী অদ্ভুত তার উৎসাহ! আর ঐ তো সেই খাঁচাটা! কিন্তু সেই চন্দনাটা গেল কোথায়?

একটু যেন ভয় পাচ্ছে গৌতম। ঘরগুলো নিস্তব্ধ—আর সকালের আলোতেও তার মনে হলো অন্ধকারের অভিসার এখনো যেন শেষ হোল না। তবু সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ওপরে। যাদের সঙ্গে দেখা হোল তাদের কাউকে সে জীবনে দেখেনি। শুধু একটা লোককে তার বাবার কথা জিজ্ঞাসা কোরতে একটা হাত দিয়ে সে একটি ঘরের দিক নির্দিষ্ট কোরে দিলো।

আর সেই ঘরে ঢুকতেই বিস্ময়ে বিহ্বল হোয়ে গেল গৌতম। প্রদীপের শেষ শিখাটির মত দপ্‌দপ্‌ কোরে জ্বলছে তার বাবার প্রাণ-প্রদীপ। হাওয়ার আমন্ত্রণ আসছে দূর সমুদ্রের স্নিগ্ধতাকে বহন কারে—আর ঘরের একটি কোনে জীবনের শেষ মূহূর্তে আত্মকৃত অপরাধের সমস্ত কাহিনী স্মরণ কোরে অনুতাপে উদ্বেলিত হোয়ে রয়েছে একটি প্রৌঢ়।

চোখ ছুটি তার অর্ধমুদিত বিকেলের আকাশের মত বিষণ্ণ—বিফল। প্রতিটি প্রশ্বাসের সঙ্গে যেন ক্ষয় হোয়ে যাচ্ছে জীবনের যতকিছু অবশেষ আর নিঃশ্বাসের সঙ্গে মর্মরিত হোচ্ছে হৃদ্‌স্পন্দন। এ দৃশ্য আর দেখতে পাচ্ছে না গৌতম, কল্পনাই কোরতে পারে না চোখের সামনে মৃত্যুর এমন পটভূমিকা।

"বাবা"—দীর্ঘ দিনের অনভ্যাস আর দীর্ঘতম দীণতার আবরণ বিদীর্ণ কোরে উঠলো গৌতমের কণ্ঠ। মনে হোল একটি যুগ নিঃশেষ হোয়ে গেছে, আর একটি নোতুন যুগের ভোর আসছে তার জীবন-সমুদ্রের তীরে।

"কে ?"—ছুটি কম্পিত অধরের ব্যবধান রচিত কোরে সামান্য

একটু শব্দ হোল। চোখের পাতা মুক্ত হোতে চাইলো কার যেন উজ্জ্বল উপস্থিতির সংবর্ধনায়, কিন্তু সে চোখের প্রান্ত বিদীর্ণ কোরে শুধু জল নেমে এলো—দেখা গেল না তার পক্ষ্মরেখা।

"আমি—আমি"—নামটাও যেন আজ উচ্চারিত হোল না গৌতমের। রসনার সামনে বিভীষিকার মত এসে ভিড় কোরলো জীবনের সমস্ত গ্লানির কালো ছায়া। তাদের সহস্র বাহুতে যেন আবদ্ধ হোলো গৌতমের কণ্ঠ।

"দেখি দেখি এদিকে আয়তো একবার। গলায় আওয়াজ যেন বলছে—এ স্বর আমি চিনি, এ স্বরের জন্যেই যেন প্রতীক্ষা করে আছি। তবে কি তুই......" আর বলতে পারলো না সেই রুগ্ন পাণ্ডুর মুর্তিটি। তার আগেই পৃথিবীর শেষ নিমন্ত্রণ সাঙ্গ কোরে সে পার হোয়ে গেল সমস্ত ম্লানিমার সমুদ্র—সমস্ত গ্লানির মরুভূমি। পাথরের মত চেয়ে আর চেয়ে গৌতমের চোখ ঝরলো অজস্র অশ্রুধারায়।

ভুলে গেল গৌতম সে সর্বহারা—গৃহচ্যুত, আর চিরবঞ্চিত। তার জীবন ভরে একটির পর একটি তরঙ্গের মত পায়ে পায়ে বেজেছে আঘাতের শৃংখল। সে আজন্ম ভিক্ষুক—সে চিরদলিত নব-কিশলয়। তবু আজ অশ্রুভারাতুর এই মুহূর্তে তার মনে হোল-রক্তের শেষ আহ্বান যদিও তার জীবনের দুঃস্বপ্ন থেকে মিলিয়ে গেল, তবু তার আজ আর কারো কাছে যেন কোন অভিমান নেই। এখন অনুপমা অবহেলা করুক—সমস্ত পৃথিবী যত পারুক দুঃখ দিক্—গৌতমের আর কোনো অভিযোগ

নেই—নেই বা পিছুটান। আজ সে সমস্ত বন্ধন মুক্ত। গৃহ ছেড়ে, অনুপমার আশ্রয় ছেড়ে আজ তার আহ্বান এলো মুক্ত প্রান্তরে আর অরণ্যে আর সমুদ্রে। এখন সে স্বাধীন—এখন সে রাজকুমার।

কিন্তু ঘরের বাইরে আসতেই কার যেন কাতর কণ্ঠে তার হৃদয় বিদীর্ণ হোল। ধীরে ধীরে ছায়ার মত এগিয়ে গেল সেই শব্দকে অনুসরণ কোরে। আর এসে দেখলো মেঝের ওপর চীৎকার কোরে ধূলোয় গড়াচ্ছে মিস্ মার্লিন—তার বাবার দ্বিতীয় বারের সহধর্মিনী আর আর পৃথিবীর সর্বশেষ অভিভাবিকা। ঘৃণায় সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো গৌতমের। অথচ বুঝলো না আজ যে বেদনায় সে লুণ্ঠিত, তার সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব তার সম্পূর্ণ নিজের নয়। ভাবলো আমন্ত্রণ না জানালে সাধ্য ছিল কি এই অবাঞ্ছিত অপরিচিত মহিলার স্বপ্নাতীত সৌভাগ্যের।

মেঝেতে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়লো গৌতম। দুহাতে মার্লিনকে ধোরে বুঝবার চেষ্টা কোরলো কোথায় তার ব্যথা—কিসের তার এত যন্ত্রণা। অথচ মাত্র উনিশ বছরে সমস্ত অভিজ্ঞতা মন্থন কোরেও এতটুকু তা আবিষ্কার কোরতে পারলো না গৌতম। ব্যর্থতায় মুখে ফুটে উঠলো বিরক্তির রেখা।

গায়ে হাত পড়তেই চোখ মেলে চাইলো মার্লিন। অস্ফুট বেদনায় সে চোখের ভাষা ধূসর। কিছুটা স্তিমিত। অবিশ্রান্ত আর্তনাদ আর ভূলুণ্ঠনে তার পরিধেয় বিবর্ণ এবং শিথিল।

"ও মাই প্রিন্স্, হোয়্যার হ্যাড্ য়ু বীন্ সো লং। লুক্ এ্যাট্

মি, আই এ্যাম্ ডাইং। প্লীজ কল্ ইন্ এ ডকটর্। এ্যাণ্ড ডোণ্ট য়ু ফিল্ দি পেইন্ আই এ্যাম্ সফ্রিং ফ্রম্?” হাতের ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো মার্লিন গৌতমের কাছে। তারপর উঠে বসে আচমকা ওর গলাটা জড়িয়ে ধোরে বললো—“বী নট এ্যাফ্রেড্ মাই বয়। দো আই এ্যাম্ উইথ্ চাইল্ড্, আই প্রমিস্ আই উইল সিম্প্লি ডেসট্রয় ইট জাষ্ট টু মেক্ ইউ ফ্রি টু লব্ মি। প্লীজ্ লব্”—

হাতের এক ঝটকায় অমনি মার্লিনের মুখটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো গৌতম। দরজার কাছে দ্রুত পায়ে এসে সে কাঁপতে লাগলো চৈত্র শেষের ঝরা পাতার মত। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবলো, একটি ঘরে জীবনাস্তের অবদমিত বাসনার নিস্তব্ধ উদ্বেগ, আর একটি ঘরে পৃথিবীর আদিমতম যন্ত্রণায় নারীর স্বাভাবিক কাতরোক্তি। একটি ঘরে মৃত্যুর সমুদ্র স্থির—আর একটিতে আসন্ন অবসানের বীভৎস প্রস্তুতি। আর ভাবতে পারলো না গৌতম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটে এলো রাজপথে।

ছয়

রাত জেগে চিঠি লিখছিল অরুণা। আর অনুপমা শুয়ে ছিল বিছানায় আলগোছে। অনুপমা মত দিয়েছে বিয়েতে—সে উচ্ছ্বাসকে আর আসন্ন দিনের নোতুন জীবনের যে ভৈরবীর তালে তালে অরুণার সমস্ত হৃদয় হোয়েছে উতলা—তাকেই ছড়িয়ে দিচ্ছিল কাগজে-কলমে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছিল অনুপমাকে আর লিখতে লিখতে হাসছিল মুখ টিপে টিপে।

"দিদি—পরশুই চলে যাই আমি। কী বলিস্! আর ওদিকে সুকুমার বাবু এতদিনে বোধ হয় নিশ্চয়ই একটা বাড়ী ঠিক কোরেছেন।" বললো অরুণা পিছন ফিরে।

"আর দুটোদিন থেকে যা রুণী। তুই চলে গেলে বড্ড একা একা লাগবে এ'কদিন। আর তা ছাড়া তোর কলেজ খুলতেও

তো এখনো অনেকদিন বাকী!” চোখের উপর থেকে তার হাতখানা আস্তে আস্তে সরিয়ে নিলো অনুপমা।

“না, না দিদি, সে হয় না। কলকাতায় এখন আমার থাকা খুবই দরকার। আর তাছাড়া কিছু তো পাওয়া যায় না এখানে। অথচ কেনা কাটা প্রায় সবই তো বাকী”—ক্যাপে কলম বন্ধ কোরে খানিকক্ষণ চুপ কোরে বসে রইলো অরুণা।

“বাধা দিতে চাই না তোমাকে। আর আমার কষ্ট হোলেই বা। সত্যিই তো সব কেনা কাটা বাকী পড়ে আছে, অথচ বিয়ে যদি এই অগ্রাণেই হয় তবে এখন থেকেই তো তার আয়োজন করা উচিত”—পাশ ফিরতে ফিরতে বোললো অনুপমা।

“তাহলে লিখে দিলুম দিদি আমি পরশুদিনই সকালের গাড়ীতে চলে যাচ্ছি। সেই-ই ভালো। আর এখানে তুই রইলি, যখন যা দরকার সব লিখে জানাবো তোকে—কিছুই ভাবতে হবে না”—আবার মুখ ফিরিয়ে লিখতে আরম্ভ কোরলো অরুণা।

লেখা যখন শেষ হোল রাত তখন প্রায় একটা। এতক্ষণ পরে ঘুমিয়েছে অনুপমা। আর দেরী করা যায় না—ঘুমে ভেঙ্গে আসছে তারো চোখ দুটো। তাড়াতাড়ি আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো অরুণা আর ঠিকানা লেখা এনভেলপটি তার ব্লাউজের গহ্বরে সারারাত রাখলো প্রচ্ছন্ন কোরে। বুকের উত্তাপের সঙ্গে

মিশে রইলো নামটা আর সমস্ত রাত ভ'রে সে নামধারীর স্পর্শ কল্পনা কোরে উত্তপ্ত হোয়ে উঠলো অসংখ্যবার অরুণা।

পরের দিনটি কোথা দিয়ে যে অতিক্রান্ত হোল, তা ভেবেই পেলনা অনুপমা। সব সময় শুধু অনুভব কোরলো এক অসহ্য বিরক্তিতে বিমর্ষ হোয়ে আছে অরুণা। যশিডিকে আর বোধ হয় ওর এক মূহূর্তও ভালো লাগছে না। চলে যাবে রাত্রি ফুরোলে, সে কথাটাই সমস্ত কাজের ভেতরে বারবার কোরে শুধু ভাবতে লাগলো অনুপমা।

অনেক রাত পর্যন্ত গোছগাছ কোরলে অরুণা। ভোর বেলায়ই তার ট্রেন। তবু রাত্রিটুকু কিছুতেই তার চোখে ঘুম আনলো না। বিছানায় শুয়ে অস্থির হোয়ে উঠলো অরুণা! কখন ভোর হবে—কখন সে দেখতে পাবে নোতুন সূর্য্যের মুখ! আর অনুপমা বন্ধ জানালা দিয়ে শুধু দূরের অন্ধকার কল্পনা কোরতে লাগলো মনে মনে।

আবার কার্তিকের শেষাশেষি একদিন মাঠের ওপর দিয়ে টমটম্ ছুটলো। দুটি বোন রইলো দুদিকে মুখ ফিরিয়ে। স্তব্ধতার সেতুর ওপর দিয়ে তারা পার হোয়ে এলো সমস্ত পথ।

ট্রেণে উঠে সেদিনকার মত হাত নাড়তে লাগলো অরুণা। আর অনুপমা মুখে আঁচল দিয়ে ভাবলো, এও কী সম্ভব! আর সম্ভব হোলই বা কেমন কোরে?

সাত

আর বাংলা দেশের কোনো অখ্যাত পল্লীর একটি অন্ধকার ঘরে অসংখ্য উজ্জ্বল উপস্থিতির আলোতে একটি মেয়েকে মনে হোল পাণ্ডুর, বিবর্ণ অথচ নির্বিকার। একটি শয্যার ওপর সে অর্ধশায়িত, তার চুল এসে নেমেছে ঘরের মেঝে। দীর্ঘ দিনের অভিশাপে তার মুখের রং কুয়াশার মত ম্লান। সকালের রোদ এসে পড়েছে তার চুলে তার কম্পিত নম্র বুকটিতে। দুটি পায়ে আলতা—দুটি হাতে তার প্রভাতের আকাশের মত জ্যোছনার রিক্ততা।

সকালের ট্রেণে আজ কোলকাতা থেকে ডাক্তার আসবার কথা। হাত ঘড়ির দিকে তাই বারবার দৃষ্টি দিচ্ছিলেন বিভাষ বাবু। ষ্টেসনে গাড়ী গেছে অনেকক্ষণ, অথচ এখনো না আসার কারণ খুঁজে পেলেন না। অস্থির পায়ে শুধু কয়েকবার ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন ঘরের ভেতর।

"লক্ষ্মী বৌমা, আর একটু ধৈর্য্য ধরো, এই এক্ষুনি ডাক্তার এসে পড়বে! লক্ষ্মী মেয়ে আমার"—কাছে এসে মেয়েটির মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন ছেলে মানুষের মত,—"তোমাকে যেমন কোরে হোক্ বাঁচতে হবে বৌমা। তোমার এ অপমানের শোধ তোমাকেই যে নিতে হবে।"

বিনিময়ে মেয়েটি হাসলো একবার। সে হাসি অনেকদিনের সঞ্চিত ব্যর্থতার বেদনায় পাণ্ডুর, অসংখ্য রাত্রির প্রতীক্ষার গৌরবে সর্বহারা। শুধু সকালের এই উজ্জ্বল আলোয় সে হাসির দীণতা সকলের চোখে প্রতিফলিত হোল। সবার কাছে আর একবার রিক্ততার বাণী বহন কোরে আনলো সে হাসি।

"কী হবে ডাক্তারে? অত খরচ কোরে আর লাভ কি?" আসন্ন মহালগ্নটির প্রতি এক অস্পষ্ট আহ্বান যেন মেয়েটির কণ্ঠে ধ্বনিত হোল।

"যাক্—আমার সব চলে যাক্, বৌমা। তুমি শুধু থেকো। তোমাকে থাকতেই হবে। আমার মত দুর্ভাগার ঘরে যখন একবার তোমার পদচিহ্ন পড়েছে—তাকে আমি কখনো নিশ্চিহ্ন হোতে দেবো না"—এবারে বিছানার ওপরে বসে পড়লেন বিভাষবাবু,—"খুলে দাও জানলা দরজা সব। খবরদার কেউ কাঁদতে পারবে না। দেখুক বৌমা আমার আলো রোদ প্রাণ ভ'রে।"

"ওকি, সব যে অন্ধকার হোয়ে আসছে। আলো কই—হাওয়াও তো আর আসছে না। সব কোথায় গেল—কোন

দিকেই বা জানলাটা? আমি খুলে দেবো—আমি দাঁড়িয়ে দেখবো তাকে। সে আসবে মন বলছে, সে আসছে—আপনারা সরে যান, তাকে আসতে দিন”—সদ্য উত্থিত তনুলতাটি তার অসীম আশায় একবার কেঁপে উঠলো। বিভাষবাবু সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধোরে আবার বিছানার ওপরে শায়িত কোরলেন।

“কই—কেউ কি এলো না এখনো”—উদভ্রান্তের মত ছুটে গেলেন বিভাষবাবু দরজার কাছে। তারপর দ্বিগুণ ব্যর্থতায় আবার ফিরে এলেন বিছানায়।

ইতিমধ্যে খবর এলো ডাক্তার এলো না। সমস্ত বাড়ীটিতে প্রতিধ্বনিত হোল সেই অনাবির্ভাবের সংগীত। আর হাতের কাছে আর একটা অসুধের শিশি অমনি আলগোছে মাটিতে ফেলে দিলো মেয়েটি। সে সঙ্গে চমকিত হোল ঘরের স্তম্ভিত মূহূর্ত।

জানলা দিয়ে অঘ্রাণের বেলা শেষের হাওয়া আসছে ঝির-ঝির কোরে। দূরে নদীর দিগন্তে লাল হোয়ে মিলিয়ে গেল সকালের সূর্য। শুয়ে শুয়ে মেয়েটি ভাবতে লাগলো, সূর্য নিশ্চিহ্ন হবার আগে বুঝি এমনি কোরেই ছড়িয়ে দিয়ে যায় রক্তরাগ—এমন অকৃপণ ভাবেই বুঝি রেখে যায় সমস্ত পরিচয়।

রাত্রির স্নিগ্ধতায় সমস্ত উত্তাপ মেয়েটির শান্ত হোয়ে আসে। জেগে থাকে তখন চোখ দুটো উৎসব-রাত্রি শেষের ভীরু প্রদীপের মত। সে চোখে কল্পনা করা যায় না দূরের ছবি—নদীর ওপারের, আরো আরো দূরের ইতিহাস। নিজের হাতখানি বুকের ভেতরে

টেনে নেয় মেয়েটি। ভালো করে অনুভব করে, কী করুণ—কত অসহায় সে হাতখানি।

তার বিছানার দুপাশে বহুরাত্রির জাগরণ-ক্লান্ত মহামানুষের ভিড়। একজনের গায়ে আচমকা হাত লেগে গেল তার। মাথার চুলে তার আঙ্গুল চালিয়ে দিতে দিতে ভাবলো, অদ্ভুত এ বাড়ীর সব কটি মানুষ। হৃদয়ের বিস্তারে এদের পরিধি পৃথিবীর মত, মমতার গভীরতায় এদের অন্তর সমুদ্রের মতই অতল। তবু কোথায় যেন একটা অসংগতি, একটা ছন্দপতনের ব্যথা অনুভব কোরলো মেয়েটি। সে ব্যথা আজ দীর্ঘ দিন ধোরে স্বপ্নে জাগরণে এমনি কোরেই সে অনুভব কোরছে বারবার।

মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে হয় তার একটি চিঠি সে লেখে। মনের মত একটি চিঠি। কিন্তু কাকে সে লিখবে—কে-ই বা পড়বে তার চিঠি। তবু ভাবে যদি একজন সে চিঠি পড়ে, একজনের কাছে যদি সে চিঠি তার এই পাণ্ডুর মুখের ভাষা ছড়িয়ে দেয়। তবে সে সার্থক। আর কাম্য নেই জীবনে কোনো কিছু। অথচ বহুযুগের ওপারে কোন অদৃশ্য অমরাবতীতে সে উজ্জ্বল হোয়ে আছে। কোন দেশের জ্যোৎস্নাতে হোয়ে আছে সে চির নোতুন—সে কথাই মেয়েটি ভেবে পেল না। সেখানেও কি কখনো অন্ধকার নামে, ডাক শোনা যায় কি সে দেশে ব্যাকুল সমুদ্রের।

অথচ হাতের দিকে তাকাতেই চোখে জল আসে তার। আঙ্গুলে নেই এতটুকু শক্তি—এর শিরায় শিরায় নেই কিছুমাত্র

আর মমতা। আজ তিন মাস ধোরে প্রতিটি মুহূর্তে এই হাত-খানিকে সে দেখে আসছে, তবু মিটছেনা যেন তার চোখের তৃষ্ণা। এই হাতে কি লেখা যায় না প্রাণভরে একখানা চিঠি। কিন্তু কত চিঠিই তো লেখা হয়েছে, কত আকুতি-ই তো পার হোয়ে গেছে স্বপ্নের সমুদ্র; কিন্তু কই—এখনোত তার আহ্বান এলো না। তার পদধ্বনিতে এই গ্রামের নদীতীর ফুলে ফুল তো মুঞ্জরিত হোয়ে উঠলো না।

দিনের পর দিন আর রাত্রির পর রাত্রি—এমনি ভাবে আবর্তিত হোয়ে চলেছে সময়ের চক্র। বসন্তে যে ফুলে বনানী হয় উজ্জ্বল, শরতে যে শুচিতায় আকাশ হয় শুভ্র—অগ্রাণের আকুল তৃষ্ণায় সে হোয়ে আসে কুঞ্চিত—কুণ্ঠিত। কিন্তু কেন—কেন ?

এই অন্ধকারে, মেয়েটি একবার ভাবলো, যদি একবার হারিয়ে যাওয়া যায়! যদি শেষমূহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখী হওয়া যায়। সেই ভালো—সেই হবে সব থেকে সুন্দর! তার বাইশ বছরের ইতিহাসে কোনো পুরুষের একটি অধ্যায়ও লিখিত হোল না। আর কপালের ওপরে সিঁদুরের ফোঁটাটি এখনো তার উজ্জ্বল—তার সীমন্ত রেখা কার অনন্ত আশা নিয়ে এখনো রঙীন। কিন্তু কার প্রতি এমন অবিশ্রান্ত প্রত্যাশা ?

শুয়ে শুয়ে সমস্ত প্রহরের অতিক্রান্তি মনে মনে অনুভব করে মেয়েটি। আজ দীর্ঘ তিনমাস ধোরে ঠিক এমনি কোরেই

রাত্রি সে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি কোরে আসছে। উঠোনে ঝিল্লী-ধ্বনি—নদীতে কলরোল ঠিক তারই মত আজো অনিদ্রিত, অনাস্বাদিত। তারাও বুঝি কারো প্রতীক্ষাতে মুখর!

শেষ রাত্রির মন্থর পাখায় ভর কোরে নেমে আসে সকালের সূর্য। সঙ্গে নিয়ে আসে অফুরন্ত কলরব। বিরক্তিতে আর একবার মুখটি ঘুরিয়ে নেয় সে মেয়েটি। সেই আলোতে সে ভাবে—তার অসহায়তা, তার দৃষ্টির দীণতা আবার সকলের মনে উজ্জ্বল হোয়ে ফুটবে।

"তুমি বরং একটা চিঠি লেখো বৌমা। আমরা তো লিখে লিখে ক্লান্ত—এবার তোমার পালা। কিন্তু সাবধান, সে চিঠির ভাষায় যেন দীণতা না প্রকাশ পায়। ও যেন জানতে না পারে তুমি তাকে আহ্বান জানাচ্ছো"—দুপুর বেলায় বিছানার কাছে এসে মেয়েটির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন বিভাষবাবু।

"না, না বৌমা, তুমি একটু নরম কোরেই লিখো, ওর কঠিন হৃদয় যদি তাতে একটু গলে। আর কী-ই বা হবে লিখে! কত চিঠি কত রকম কোরেই তো লেখা হোলো—কোনো উত্তর এলো কি তার"—বিফলতায় একবার ক্ষীণ হেসে বললেন বিভাষ বাবুর স্ত্রী—"এক একবার ভাবি কি কপাল নিয়ে তুমি এসেছিলে বৌমা। সমস্ত জীবন ভরে শুধু দুঃখই নিয়ে গেলে। অথচ অভাব কি তোমার!"

"বৌমার পায়ের যোগ্য সেই স্কাউনড্রেলটা? এই লেখা-পড়া সে শিখেছে? কুলাঙ্গার! চাই না অমন ছেলে। আমি জানবো আমার বৌমা বিধবা, সে-ও বরং সইবে।" ছলছল কোরে উঠলো বিভাষ বাবুর চোখ দুটো। মেয়েটি লক্ষ্য কোরলো তা ভালো কোরে। আজকে আর তার কান্না আসে না একথা শুনে। আর প্রাণ ভরেই বা তার কাঁদবার শক্তি কই?

আট

সমস্ত রাত ধোরে ফক্স্‌ট্রট্‌ আর অর্কেষ্ট্রার অপূর্ব শব্দতরঙ্গ উপভোগ কোরে যখন বাড়ী ফিরলো সুকুমার, আকাশের গায়ে তখন রাত্রির আর কোনো চিহ্নই নেই। দরজার সামনে ট্যাক্সীটা দাঁড় করিয়ে রেখে বসে রইল তাতে সে কিছুক্ষণ। আর পা দোলাতে লাগলো অস্পষ্ট নাচের তালে তালে। ব্যালকনিতে বসে যে শিহরণ সে অনুভব কোরেছিল এখনো তার যেন রেশ সঞ্চিত হোয়ে আছে তার মনে কিছুটা। কী অদ্ভুত ষ্টেপিং, আর মিউজিক। ভুলেই গেল সুকুমার সমস্ত রাত্রি সে কোথায় ছিল।

এতক্ষণে হয়তো তার জন্যে ভেবে ভেবে ঘুমিয়ে পড়েছে অরুণা। তার হোষ্টেলে এই মূহূর্তে যদি সে ঢুকতে পারতো তবে দেখতো—কী করুণ তার এই প্রতীক্ষা কোরে কোরে ঘুমিয়ে পড়া! কিন্তু লুকোচুরি আর ভালো লাগে না সুকুমারের।

কবে সেই অভ্রাণের বহু-প্রতীক্ষিত দিনটি আসবে, কখন সেই সন্ধ্যের অসংখ্য উলুধ্বনির ভেতরে নক্ষত্রের মত শুভলগ্নটি জ্বলজ্বল কোরে উঠবে, ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে সে কথাই ভাবতে লাগলো সুকুমার। আর একবার দুঃখ হোল ভেবে এমন সুন্দর নাচটি অরুণার হয়তো আর দেখা হোল না।

রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি জড়ানো রয়েছে সুকুমারের দুটি চোখে। ঘরে ঢুকে আর কোনো কিছু ভাবা তার পক্ষে সম্ভব হোল না। জুতো শুদ্ধ পা দুটো তুলে দিলো বিছানায়। তারপর ঘুমের প্লাবনে ভেসে চললো স্বপ্নলোকে, কল্পপুরীতে আর মানসস্বর্গে।

দুপুরে অরুণা এলো একটি অশ্রু-সজল মেঘের মত। যেন এক্ষুণি বর্ষণ সুরু হবে সুকুমারের স্তম্ভিত আকাশে।

"বেশ লোক তুমি! কাল সারা রাত তোমার আশায় আশায় রয়েছি আর তুমি একবারো এলে না। অথচ এদিকে তোমার জন্য যশিডিকে ছেড়ে এলুম—দিদির মনে দুঃখ দিয়ে এলুম—আরো কত কি। এমনি কোরেই বুঝি তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে চাও?"—মুখ ভার কোরে তাকালো অরুণা সুকুমারের উল্টো দিকে।

"সত্যি অরুণা—ভীষণ অন্যায় হোয়ে গেছে আমার। কিন্তু কালকে এমন একটা নাচ দেখেছি যা দেখলে তুমিও খুসী হোতে। চমৎকার সে নাচ, আমি জীবনে কখনো দেখিনি"—উঠে এসে অরুণার হাত দুটো ধোরে বোললো সুকুমার,—

"চলনা, আজকে আমরা দুজনে যাই। এ নাচ একবার দেখলে পুরোণো হয় না।"

"সত্যি যাবে? বেশ আমি তবে হোষ্টেলের সুপারকে বলে যাবো যে আমি আজ ফিরতে পারবো না, একটি মেয়ে বন্ধুর বাড়ীতে নেমন্তন্ন আছে। দি আইডিয়া! কুমার খুব ভালো হবে। আর তুমি পাশে না থাকলে নাচ আমার ভালোই লাগবে না"—বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো অরুণা। তারপর দরজার কাছে এসে আবার ফিরে এলো,—"আমি ঘণ্টাখানেকের ভেতরে প্রস্তুত হোয়ে আসছি। তুমি ততক্ষণ এক একটা কোরে সিগ্রেট ধ্বংস করো।" একটা সিগ্রেট থেকে পর পর কয়েকটা টান দিয়ে নিজের মনিব্যাগের পরিধিটা একবার অনুভব কোরে নিলো সুকুমার। ততক্ষণে নিশ্চয় অরুণা ট্রামলাইন পার হোয়ে গিয়ে অপেক্ষা করছে একটা ফাঁকা ট্রামের জন্য!

এলো যখন অরুণা আগুণের শিখার মত তার ঝল্‌মল্‌ কোরে উঠলো সর্বাঙ্গ। একটা লাল সিল্কের সাড়ীতে মনে হোল যেন একটি ও উজ্জ্বল দীপশিখা—আলোকের আকর্ষণে অসংখ্য পতঙ্গের হাহাকারের ইতিহাস করুণ হোয়ে আছে যার আঁচলে। এমনি প্রাণবন্ত—এমনি বেগবতী সে।

কিন্তু জীবনে যা একদিনো কল্পনা করেনি, আজকে এই বিচিত্র সন্ধ্যায় সে দৃশ্য দেখতে হোল অরুণার। বালিশের ভেতরে মুখ ঢেকে নিস্তব্ধ হোয়ে আছে সুকুমার। আর তারই পাশে উড়ে উড়ে যাচ্ছে একটি খোলা চিঠি।

কাছে এসে উদভ্রান্তের মত অরুণা তুলে নিলো সে চিঠিটা। কিন্তু সে চিঠির প্রতিটি অক্ষর পড়ে পড়ে তার মনে হোতে লাগলো, জীবনে এমন চিঠি সে কোনোদিনো পড়েনি। আর না পড়লে তার জীবন অভিশপ্ত হোয়ে থাকতো আক্ষেপে, বেদনায় আর বঞ্চনায়। বার বার সে পড়তে লাগলো পাগোলের মত। কী উজ্জ্বল—কী অদ্ভুত সেই চিঠি !

শ্রীচরণেষু।

এ চিঠি তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছবে কি না জানিনা, আর পৌঁছলেও তুমি পড়বে কিনা তাও জানি না। তবু লিখছি। কারণ না লিখে আর পারছি না। অনুরোধ, শুধু একটিবার প'ড়ো তুমি। তোমাকে লেখা এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি। হাত কাঁপছে, চোখ ঝাপসা হোয়ে আসছে আমার—তবু লুকিয়ে লুকিয়ে লিখছি। শুনেছি, তোমার সঙ্গে একদিন আমার বিয়ে হোয়েছিল। আর এ-ও শুনেছি আমি দেখতে বিশ্রী বলেই তুমি বিয়ের পরের দিনই চলে গিয়েছিলে। হিসেব কোরে দেখেছি, সে আজ প্রায় পাঁচ বছর। অথচ এর ভেতরে তুমি একটি দিনের জন্যও এ বাড়ীতে পা দাওনি। আমার রূপের অপরাধে তোমার আপন জন তোমার কাছে বঞ্চিত হোয়েছে—এ দুঃখ আমার মরবার পরেও থাকবে।

আজ দীর্ঘ তিন মাস ধোরে আমি শয্যাগত। ডাক্তারেরা ভরসা দিয়ে গেছেন, আমি বাঁচবো না। আর বাঁচলেও নাকি

চোখ দুটো আমার চিরদিনের মত অন্ধ হোয়েই থাকবে। অতএব আমাকে আর এ পোড়ামুখ নিয়ে তোমাকে দেখতে হবে না। তুমি চির সুন্দরই থাকবে। একটা কথা শুধু তোমাকে জানিয়ে যাই। তোমার সঙ্গে আমার যে কোনোদিন মালাবদল হোয়েছিল, এমন কথা ভাববার দুঃসাহস পর্যন্ত আমার আজ নেই। তাই অনুরোধ, তুমি পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর মেয়েকে তোমার চির সঙ্গী কোরে এনো। আর তার আগে যদি না মরি, যদি আমার কলঙ্কিত উপস্থিতি তোমার নোতুন দিনের সমস্ত উৎসবকে ম্লান কোরে দেয়—তবে তোমার কাছে এই শুধু প্রার্থনা, পৃথিবীতে আমার আবির্ভাবকেই সব থেকে বেশী অপরাধী মনে কোরো—আমার বিয়েকে নয়। শুধু দুঃখ, তোমার দেবতার মত মা বাবাকে ছেড়ে যেতে হোচ্ছে। আর সে ব্যথা এখন থেকেই আমার বুকে এসে বাজছে। তবু চির বিদায় নেবার আগে তোমার কাছে আমার পৃথিবীর শেষ প্রণতি পৌঁছে দিয়ে যাই। জানিনা, তা গ্রহণ কোরলে কি না।

হতভাগিনী প্রণতি—

চোখ ভেঙ্গে জল এলো অরুণার সেই প্রণতির প্রতি প্রণতিতে। চিঠিখানি হাতের ভেতরে কোরে ভাবতে লাগলো সেই গ্রাম্য দুহিতার কথা, যার জীবনে ফুল ফুটেছিল একদিন—যার বাসনার বিস্তৃতি ছিল একদা দিগন্ত-ছোঁয়া। বুক ভরা তার ভালোবাসা, চোখ ভরা তার স্বপ্ন। প্রতি নিঃশ্বাসে সে কামনা

কোরেছে একটি পরিচিত পদধ্বনি। অথচ তার প্রতীক্ষার শেষে এলো না সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ। অন্ধকারে প্রণতির সব ফুল তাই নিঃশব্দে ঝরে গেল।

ভুলেই গেল অরুণা, সে এসেছিল যৌবনের ছন্দিত দেহ-তরঙ্গ দেখতে। সেই মুহূর্ত্তে, সেই লাল সিল্কের সাড়ীতে তার মনে হোল এ রক্তিমা তাকে বিদ্রূপ কোরছে—তাকে উপহাস কোরছে আপাদমস্তক। আর চিঠির করুণতায় তার সমস্ত অন্তরে সে এতটুকু অনুভব কোরলো না অভিমান। একবার শুধু স্তব্ধ হোয়ে প্রার্থনা কোরলো প্রণতিকে দেখবার—সেই অপরিচিত মেয়েকে হৃদয়ের গভীরতম কৃতজ্ঞতা জানাবার।

সুকুমারের দিকে একবারো ফিরে চাইলো না অরুণা। আস্তে আস্তে চিঠিখানি রেখে দিয়ে বেরিয়ে এলো ধীরে ধীরে। সমস্ত পথে হাঁটতে হাঁটতে লজ্জায় লাল হোয়ে উঠলো অসংখ্যবার। আর ঘৃণায় সুকুমারের মুখের চেহারাটা পর্যন্ত একবার কল্পনা কোরলে না অরুণা।

সে রাত্রের ট্রেণেই আবার যশিডিতে ফিরে এলো অরুণা। কোলকাতা এক মুহূর্ত্তও আর ভালো লাগলো না। বিষিয়ে উঠেছে যেন তার সহস্র পথ—অজস্র অট্টালিকা।

পরের দিন সুকুমারকেও আর কোলকাতার কোথাও দেখা গেল না।

নয়

আর যশিডিতে ফিরে যে দৃশ্য চোখে পড়লো অরুণার, তার একুশ বছরের জীবনে তা প্রথম স্মরণীয় হোয়ে হইল। ছন্দের ভিতর দিয়ে কেটেছে তার জীবন, সৌভাগ্যের আকাশে তার সমস্ত পরিচয় হোয়েছে রঙীন। কিন্তু আজ এই যশিডিতে —এই রুক্ষ অনুর্বর মরুপ্রান্তরে যে স্বপ্নাতীত কিশলয় সে আবিষ্কার কোরলো, সে আবিষ্কারের গৌরবে মনে মনে অসংখ্যবার উজ্জ্বল হোল অরুণা। অবাক হোয়ে সে শুধু ভাবলো, তার জীবনের দ্রুত লয়ের মুহূর্ত আজ অতিক্রান্ত —এখন স্বুরু বিলম্বিত—বিষণ্ণ লয়ের। দুপায়ে তার কেঁপেছে পৃথিবী, দু'চোখে তার ভেসেছে আকাশের অনন্ত নীলিমা; কিন্তু আজ সে নীলিমার লগ্ন নিঃশেষ, সেই পৃথিবীর প্রাণ-

স্পন্দন নিস্তব্ধ। একদিন যাকে সে অনাদরে অবহেলায় দূরে নিক্ষেপ কোরেছিল, তারই কাছে আজ তাকে ফিরে আসতে হোল আবার।

অনুপমার কাছে যখন সব শুনলো একটু একটু কোরে, এই অবহেলিত—চিরলাঞ্ছিত বীর কিশোরের প্রতি শ্রদ্ধায় সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হোয়ে এলো অরুণার। ভাবতেই পারে না, তরঙ্গের পর তরঙ্গ ব্যর্থ কোরে কেমন ভাবে একটি তরুণের পক্ষে এ সম্ভব। জীবনের আজন্ম রিক্ততায় গৌতম তাই বিকৃত-মাস্তিষ্ক আর হৃদয়ের গভীরতম প্রতীক্ষার গৌরবে প্রণতি তাই সর্বহারা। একজন আকর্ষণ করে দীণতায়, আর একজন আহ্বান জানায় মহত্বে। মানব চরিত্রের দুটি বিশিষ্ট দিগন্ত যা শূন্যতায় তার কাছে হোয়ে রইল চির উজ্জ্বল।

আর অনুপমাকে মনে হোল সাগরপারের নিস্তরঙ্গ আকাশের যেন স্নিগ্ধ গোধূলি। নারী জীবনের যে বিচিত্র মুহূর্ত্তে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস হয় অসংযত—বাতায়ণ প্রান্তে দুখানি আয়ত আঁখি যখন কল্পনার ইন্দ্রধনুতে উধাও হোয়ে যায় সীমাহীন শূন্যে, আর জীবন ভ'রে নারী কামনা করে তার স্বপ্নে—জাগরণে এক চিরসুন্দরের, সেই মুহূর্ত্তে অনুপমা সবিতার মত সাদা সাড়ীতে ভিক্টোরিয়া স্কুলে তার সমস্ত স্বপ্নকে ব্যর্থ কোরেছে—একটি উচ্ছলযৌবনার আগামী দিনের আসন্ন উজ্জ্বলতার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ কোরেছে, আর স্বজন বঞ্চিত এই নির্বান্ধব যশিডিতে রাত্রির পর রাত্রি বিভীষিকায় বিবর্ণ হোয়ে তার ললিত যৌবনকে ব্যর্থতায় নিঃশেষ

কোরেছে। অনুপমা পৃথিবীর মাত্র একটি মেয়ে—যার আঁচলে অকৃপণ স্নেহ, নয়নে অনন্ত মমতা।

"তারপর"—শুয়ে ছিল, বালিশে কনুই ভর কোরে বলে উঠ্‌লো অরুণা।

"তোরা তো ওকে ঘরে ঢুকতে না দিয়েই বেরিয়ে গেলি। আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম দরজায়। আর এমন সময় ও এলো। কী চেহারা তখন মুখের! মনে হয় একটি দিনো পৃথিবীতে কেউ কখনো ওর আপন হয়নি"—আঁচলে চোখ মুছে একটি ভারী নিঃশ্বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগলো অনুপমা, —"কিন্তু রুণী ও-ও আমাকে ভুল বুঝলো। আমি অভিমান কোরে বলেছিলাম, ওরা আমার অতিথি—কেন তুমি ওদের গায়ে হাত দিতে গেলে? আর অমনিই ওর হোল অভিমান।"

"কিন্তু হাত তো সে আমাদের গায়ে দেয়নি—আমিই বরং তাকে যা নয় তাই বলে গালাগালি দিয়েছি",—বালিশে তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকলো অরুণা।

"সেই যে তারপর চলে গেল ওর বাবার কাছে, আর এলো না। পরে ওর অসংলগ্ন কথায় যা বুঝেছি, তাতে সেদিনই ওর বাবাকে দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে ওর বাবা ওকে চিন্‌তে পারেননি। আর পাশের ঘরে সেই শ্বেতাঙ্গী মহিলার প্রলুব্ধ দৃষ্টি আগের মতই ছিল অমাতৃ-সুলভ। অতএব মাতৃহারা, পিতৃ-পরিত্যক্ত, অবাঞ্ছিত জননী-প্রার্থিত, বিত্তহীন, চির-অনাদৃত, আজন্ম উদ্‌ভ্রান্ত, পৃথিবীর কল্পিত শেষ-আশ্রয়-চ্যুত

গৌতমের শেষ জীবনে বিকৃত-মস্তিষ্ক না হওয়া ছাড়া আর কি পথ ছিল"—এবারে অনুপমার অশ্রু কোনো বাধাই মান্‌লো না—গড়িয়ে পড়লো পাহাড়ী ঝর্ণার মত।

"তারপর ?"—অনুপমার কোলের কাছটিতে আস্‌তে চাইলো অরুণা। কিন্তু আজ তাকে স্পর্শ কোরে কলঙ্কিত কোরতে তার সাহস হোল না। সামান্য একটি দৃষ্টিও সে আজ দিতে পারিলো না অনুপমার দিকে।

"পাটনা থেকে ঘুরে ঘুরে সব জায়গায় ও বেড়াতে লাগলো। এদিকে চল্‌লো পুলিশের অত্যাচার, তাদের অমানুষিক লাঞ্ছনা, দিনের পর দিন গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বেড়ানো। একদিন ও আবিষ্কার কোরলো—ওর যেন সব কিছু এলোমেলো হোয়ে যাচ্ছে। সমস্ত দিন রাত্রি সেদিন শুধু হাসলো চীৎকার কোরে আর গান কোরে। আর তারপর ঘুরতে ঘুরতে চলে এলো এই যশিডিতে। কিন্তু তবু কি সে আমার কাছে আসে। দুবেলা চেয়ে দেখতুম, দূর দিয়ে আপন মনে ও চীৎকার কোরে গান গাইতে গাইতে চলে যায়।" এ পর্যন্ত বলে বিছানার ওপর স্তব্ধ হোয়ে বসে রইলো অনুপমা।

"সেদিন ঘরে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদলুম। তোর কাছে বলতে লজ্জা কি রুণী—ভালো আমি ওকে বেসেছিলুম। আর এমন ছেলেকে না বেসে থাকাও যায় না। কিন্তু একটি দিনের জন্য সে তা বোঝেনি। ও আসতো এখনে আশ্রয় নিতে, পুলিশের চোখে ধূলো দিতে, আমার আকর্ষণে নয়। সত্যি,

এক একবার ভাবি, কী ভীষণ ছেলেমানুষ ও। আমার উচ্ছ্বাস একটি দিনের জন্যও বুঝলো না।”

“পাড়ার কয়েকটা ছেলেকে ডেকে একদিন বললুম জোর কোরে ওকে এখানে ধোরে আনতে। সহজে কি সে আসতে চায়। মেরে ধোরে সকলকে তাড়িয়ে দেয়। শেষে সোজা আমি গেলুম ওর কাছে। আর আমাকে দেখেই হেসে উঠলো এমনভাবে যে—সে হাসি ওর দশ মিনিটেও থামলো না। ভয় পেলুম একটু, তবু সাহস কোরে ওর হাত ধোরে বললুম,—এসো আমার সঙ্গে। আর অমনি চোখ দুটো কেমন যেন হোয়ে এলো ওর। আমার মুখের ওপর কিছুক্ষণ ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখলো। তারপর শীর্ণ ঠোঁট দুটো দিয়ে একটা অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে রুগ্ন পায়ে ছুটে পালালো।”—বলতে বলতে উঠে চলে এলো অনুপমা জানলার কাছটিতে। চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ দূরের অন্ধকার মাঠের দিকে। তারপর আবার ফিরে এলো বিছানায় অরুণার পাশটিতে।

“একদিন মাঝ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভীষণ শীত পড়েছে যশিডিতে, সকালের আগে গা থেকে লেপ সরানো যায় না। তবু উঠে বসে শব্দ লক্ষ্য কোরে এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিলুম। দেখলুম সেই নির্মম শীতে শুধু গায়ে ঠক্ ঠক্ কোরে ও কাঁপছে। দেখে চোখে জল এলো আমার। অথচ কিসের ওর অভাব ছিল। অর্থ—প্রতিপত্তি—ঐহিত্য, এ সবের কিছুরই তো ওর অভাব ছিল না। কিন্তু যাক্ সে কথা। হাত ধোরে সেদিন

আমার সর্বশক্তি প্রয়োগ কোরে তুলে নিয়ে এলুম ঘরে – আমার বিছানাটিতে। কথায় কথায় বুঝলুম স্বাভাবিকতার—মানসিকতার কোনো চিহ্নই নেই ওর চিন্তায় আর মস্তিষ্কে। রাত ভ'রে ওর পাশে পাশে রইলুম, ভয় হোল কখন আবার ও পালিয়ে যায়। অথচ আশ্চর্য! এ বাড়ী থেকে আর ও গেল না। কিন্তু হোলে কি হবে, এই দেখছিস ও ঘুমিয়ে আছে, কে বলবে ও স্বাভাবিক মানুষ নয়; কিন্তু মাঝরাত্রে উঠে ওর সমস্ত জীবনের ব্যর্থতার কাহিনী চীৎকার কোরে শোনাতে থাক্‌বে, কখনো কাঁদবে কখনো বা হাসবে। কিন্তু সে হাসি আমার ভালো লাগে না অরুণা।" অরুণার হাত দুটি ধোরে কম্পিত-কণ্ঠে বোললো অনুপমা। সে স্বরে প্রকাশ পেল আসন্ন আঘাতের প্রতি এক সহজ উৎকণ্ঠা, আগামী শূণ্যতার প্রতি এক দুর্ণিবার উদ্বেগ।

অপরিসীম লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল অরুণা। মুখের সমস্ত রক্তিমা যেন আরো উচ্ছ্বসিত হোল তার। জীবনে একটি বারো আকাশের নীচে এসে প্রভাতের অবগুণ্ঠিত শুকতারা টিকে সে লক্ষ্য করেনি, সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে অস্তমিত দিগন্তের শেষ আলোক রেখাটির রিক্ততাকে মনে মনে একদিনো সে অনুভব করেনি। তার জীবন-যৌবন স্পন্দিত হোয়েছে অর্কেষ্ট্রার তালে তালে, নাচের ছন্দে ছন্দে। কিন্তু আজ এই অভিনব অনুভূতির গোধূলিতে তার সমস্ত হৃদয় কেন মর্মরিত হোয়ে উঠলো! অরুণা ভাবতেই পারে না তা। দুহাতে তাই মুখ ঢেকে সমস্ত রাত্রি অনুতাপে শুধু অবশ হোয়ে উঠলো।

আর সুকুমারের কাহিনী শুনে এতটুকু উচ্ছ্বাস দেখালো না অনুপমা। ওর প্রশান্ত সমুদ্র-বক্ষে এই অভাবিত অধিকার কোনো তরঙ্গই সৃষ্টি কোরলো না। বরং সুকুমারকে মনে মনে অভিনন্দিত কোরলো অনুপমা—জীবনে আলোর পিছনে এমন অকৃপণ অনুসরণের মহিমা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে। আর প্রণতিকে পাঠালো অন্তরের অকুণ্ঠিত অনুরাগ। বসালো তাকে নারী-হৃদয়ের মহিমার অক্ষয় সিংহাসনে। মৃত্যুর ভেতরে প্রণতি রেখে গেল নম্রতার শেষ স্নিগ্ধতা, প্রতীক্ষার ভেতরে সমস্ত পৃথিবীকে উপহার দিয়ে গেল আজন্ম-সঞ্চিত অভিশাপের মাধুরী।

"দিদি, আমি এবার কি কোরবো—বলে দে। তোকে আমার দিদি বলে ডাক্‌তেও লজ্জা করে। ভাবি, সমস্ত জীবন ভ'রে যদি তোর পা ছুঁয়ে প্রার্থনা করি প্রায়শ্চিত্তের, তবুও হয়তো আমার এ অপরাধ যায় না"—আস্তে আস্তে অরুণাও উঠে এলো জানলার কাছে। দীর্ঘদিন পরে জানলায় আজ দেখা গেল তৃতীয়ার শশিরেখা।

অথচ অরুণাকে এতটুকু সহ্য হয় না গৌতমের। লুকিয়ে সে কাছে এলে চীৎকার কোরে তার উপস্থিতি ঘোষণা করে গৌতম। তুহাতে শরীরের শেষ শক্তি প্রয়োগ কোরে অরুণার ঘন চুলের মুঠি শক্ত কোরে ধরে—আর হাসে সর্বহারার মত। আশ্চর্য! অরুণা এতটুকু তাতে আহত হয় না, দেহের ওপর এমন নিগ্রহ সে বরং মনে মনে উপভোগ করে। ঐ তুটী শীর্ণ হাতের উত্তাপ—

অমন ব্যাকুল তুটী চোখের দৃষ্টি যেন তার সমস্ত তনুতে ছড়িয়ে দেয় স্নিগ্ধ শিহরণ। খুসীতে নিজেকে তাই গৌতমের কাছে মুক্ত কোরে দেয় অরুণা · তার প্রতিটী আঘাতকে সে আহ্বান কোরে নেয় সানন্দে।

"আমাকে তোর পাশে পাশে একটু থাক্‌তে দিস্ দিদি। তোর সব ভালো এ আমার এখনো সহ্য হয়না যে"—অনুপমার বুকের ভেতরে মুখ লুকোলো অরুণা।

"তুই সব সময় তো আমারই সঙ্গে সঙ্গে রুণী। ভেবেছিস্, আমি তোকে ভুল বুঝেছি। ছিঃ, তাতে তুই কত ছোট হোয়ে যাস্—তা জানিস? আমিতো ভালো কোরেই জানি তুই এতটুকু বদ্‌লাসনি।"—পিঠের ওপরে অরুণার হাত বোলাতে বোলাতে বোললো অনুপমা।

"তোকে অপমান করেছি, এ তুঃখ আমার বরং সইবে; কিন্তু তোর হৃদয় নিয়ে বিদ্রূপ করেছি, এ জ্বালা আমার মর্‌বার পরেও থাক্‌বে দিদি।"—আর একবার অনুপমার কোলের কাছটীতে এগিয়ে এলো অরুণা।

"দূর পাগ্‌লী! আমি তো জানি, তুই সুকুমারকে সত্যিই ভালো বেসেছিলি। সব কিছু অন্যায় হোলেও তোর এ ভালোবাসা যে খাঁটী—তা আমি এখনো বল্‌তে পারি রুণী"—অরুণাকে আরো কাছে টেনে নিলো অনুপমা।

সে রাত্রে তুটী বোন্ তুজনের সমস্ত ব্যবধান দূর কোরে পরস্পরের অঙ্গীভূত হোয়ে গেল।

অঘ্রাণের ঋতু-চক্র আবর্তিত হোতে হোতে ফাল্‌গুণে এসে স্থির হোল। কুঞ্চিত পত্রপুটে আবার মুকুলিত হোল সহস্র আঁখি। কৃষ্ণচূড়া ছড়ালো সীমাহীন শূণ্যে তার যৌবনের রক্তিম ঠিকানা, আর ঝরা বকুলের সৌরভে অরণ্যে অরণ্যে বাজলো ব্যাকুল বন-মর্মর। অথচ এই তিনটী মাসে গৌতমের এতটুকু ধ্যান ভাঙলো না। তার মুদিত কমলের মত কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুটী মেয়ের কোনো অঙ্গেই এতটুকু আলো বর্ষালো না।

সমস্ত তুপুর স্কুলে বসে অস্থির হোয়ে উঠলো অনুপমা। ভাবলো অরুণার কা সাধ্য একা একা গৌতমকে খুসী করে! এক অক্ষরও তাই আর তার পড়ানো হয় না, জানলা দিয়ে শুধু দৃষ্টি মেলে দেয়। আর সে দৃষ্টি মুক্ত প্রান্তর অতিক্রম কোরে গভরমেণ্ট কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে একটী ঘরের সাম্‌নে এসে আহত হয়। সেখানেই মনে মনে একটা যন্ত্রণা অনুভব করে অনুপমা। তবু ভাবে এতক্ষণে অরুণা হয়তো স্নান করিয়ে গৌতমের পাশটিতে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, হয়তো কাছে বসে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার পৃথিবী থেকে, তার তুবাহুর সমস্ত বন্ধন ছিন্ন কোরে। না-না, আর ভাবতে পারে না অনুপমা, মাথাটা তার যেন ঝিম্‌ঝিম্ কোরে ওঠে।

দশ

আর অনুপমার উপস্থিতি প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব কোরে ক্লান্ত হোয়ে গেল অরুণা। হৃদয়ের সমস্ত ম্লানিমা মুক্ত কোরে সে যত অগ্রসর হোতে চায় গৌতমের দিকে, ততই তাকে আরো দূরে সরিয়ে রাখে গৌতম। ভেবেই পেলনা অরুণা, চিন্তায়—যুক্তিতে যার নেই এতটুকু স্থিরতা—বিন্দুমাত্র সংগতি, তার মনের বদ্ধ দরজা সমস্ত ঝংকার দিয়েও কেন সে খুলতে পার্‌ছে না!

"তুমিতো অনুদির বোন্—অথচ তার মত তুমিতো দেখতে নও। আর ঘুরে ঘুরেই বা কেন সব সময় আমার কাছে আসো? কই অনুদিতো আসে না"—একদিন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বলে বোসলো গৌতম—"তুমি আমার কে?"

"আমি?"—দূরে ছিল অরুণা, ছুটে এলো খুসীতে উচ্ছ্বসিত হোয়ে কাছে, "আমিও তোমার মত সর্বহারা। আমারও যে কেউ নেই আর—"

"তুমি গান জানো অনুদির মত ? গাইতে পারো গলা ছেড়ে ? আচ্ছা, তুমি অনুদির মত স্কুলে যাওয়া না কেন ? অনুদি তো দুপুরে একদিনো এখানে থাকে না—অনুদির বুঝি বিয়ে ?" প্রশ্নের এক একটি এলো মেলো তরঙ্গ এসে আঘাত করে অরুণাকে। আর অরুণা নিজেকে সম্পূর্ণ মেলে দেয় সে-প্লাবনের মুখে। ভাবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাক্। নিয়ে যাক কূল ছেড়ে নোতুন দিগন্তে. অনাবিষ্কৃত আকাশের নীচে।

"আচ্ছা, অনুদি তোমার কে ?" এক একবার অভিমানের অভিনয়ও করে অরুণা। ভাবে—সামান্য একটু দীপ্তিতে যদি তার কুয়াশা ঝরে যায়।

"কী জানি ! আমি কিন্তু তাবলে আর পাটনায় যাচ্ছি না। একটা ভারী সুন্দর মেয়ে আছে সেখানে, ঠিক অনুদির মত দেখতে ! কী নাম যেন তার··· ! জানো তুমি ?" হাত দুটো ধোরে প্রাণপণে অরুণাকে একটা ঝাঁকুনি দেয় গৌতম।

"আমাকে একবার নিয়ে চলোনা সেখানে, দেখে আসি সে মেয়েটাকে"—হাতটা আর ছাড়িয়ে নেয় না অরুণা। বরং গৌতমের হাতের ওপর তার মসৃণ আঙ্গুলগুলো ধীরে ধীরে বোলাতে থাকে।

"দূর বোকা—আমার বাবা যে সেখানে নেই ! আমার বাবা ?"—বিছানার ওপর একলাফে উঠে বোসলো গৌতম। তারপর ঝড়ের মত নেমে পড়লো খাট থেকে। দুহাতে তাকে সঙ্গে সঙ্গে আটকাতে গেল অরুণা, অমনি হাতের এক ঝটকায়

তাকে মেঝের ওপর ঠেলে ফেলে দিয়ে রোগা পায়ে ছুটে এলো দরজার কাছে। আর দরজা খুলে বেরোতেই মুখোমুখী হোয়ে গেল অনুপমার সঙ্গে। তার বিস্তৃত ভুবাহুর আমন্ত্রণ অবহেলা কোরে একটি পা-ও অগ্রসর হোতে পারলো না গৌতম। অনুপমার হাত ধোরে আস্তে আস্তে আবার ফিরে এলো তার বিছানায়। আর মেঝেতে বসে দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে নিতেও তা ভালো কোরে লক্ষ্য কোরলো অরুণা।

ভারী ভালো লাগলো এই অপূর্ব দৃশ্যটি আজ অনুপমার। গর্বে ওর ভরে গেল সমস্ত বুক। ভাবলো, অন্ততঃ একটি পুরুষেব কাছে তার আকুলতার আবেদন কোনো দিনো ব্যর্থ হয়নি। আর হোলেই বা গৌতম অপ্রকৃতিস্থ! জীবন ভ'রে বঞ্চনাব আগুণে পুড়ে পুড়ে তাইতো আজ এমন কোবে ও সর্বহাবা। আজ তাই অনুপমা ভাবলো, মুক্ত কোবে দেবে ওর অনু-রাগের বন্যা, আর সে প্লাবনে হৃদয়ের সমস্ত যন্ত্রণা গৌতমের শোষণ কোরে তাকে স্নিগ্ধ কোরে দেবে; আবার গৌতম নিজেকে ফিরে পাবে, আপনার উপস্থিতির ভেতরে আবার সে হোয়ে উঠবে উজ্জ্বল।

আর অরুণা আস্তে আস্তে ক্ষয়িত হোল তার অনন্ত সাধনায়। ওর প্রাণ-প্রদীপের বুক পুড়িয়ে যে আলো বিকীর্ণ হোল—ভাবলো, তাতে যদি সুন্দর হোয়ে ওঠে গৌতম, তবে জীবনের শেষ মুহূর্তে সমুদ্র পারে দাঁড়িয়ে একটি নোতুন দিগন্ত আবিষ্কার কোরে যাবে অরুণা। শীত-শীর্ণ মুকুলের প্রান্তে

চৈত্রের রক্তিমায় সে উজ্জ্বল কোরে যাবে একটি নিভৃত বনানী।

"ও আর ভালো হবেনা-রে দিদি। দেখছিস্ না চোখ দুটো দিন দিন কি রকম সাংঘাতিক হোয়ে উঠ্‌ছে"—হৃদয়ের সমস্ত উদ্বেলতার কণ্ঠ প্রাণপণে রুদ্ধ কোরে আনে অরুণা। কূল ছাপিয়ে বুঝি বা তার আকুতি উচ্ছ্বসিত হোয়ে পড়ে।

"ঠিক বুঝতে পারছি না রুণী। আমারো যেন কেমন ভয় ভয় কোরছে! স্কুলের সেক্রেটারীকে একটা খবর দেবো?" বসে পড়লো অনুপমা একটা বিদ্যুল্লেখার মত। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো শুধু গৌতমকে।

"সেই বরং ভালো দিদি। আমরা মাত্র দুটি মেয়ে—আমাদের সাধ্য কি!"

একি বোলছে অরুণা! কাঁটার ভিতরে আবদ্ধ কলিকাটির মত নিজেকে রাখতে চায় নাকি সে লুকিয়ে!

"আর দিদি দুপুরে আমার একা একা বড্ড ভয় করে আজকাল। আমাকে সব সময়ে আঘাত কোরেই যেন ও খুসী হয়"—অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে প্রাণপণে চেপে ধরে নিজের বুকটাকে অরুণা।

তার পরের দুটো দিন স্কুলে গেল না অনুপমা। কাকে দিয়ে খবর পাঠালো সোমনাথ বাবুকে। আর বসে বসে ভাবতে লাগলো—পরাজয়ের তারকা কি তার ভাগ্যাকাশে একরকম স্থির! তার পক্ষপুটে যাকে সে আমন্ত্রণ কোরেছে এতদিন,

তার দুটি কম্পিত বাহুর বন্ধনে যাকে সে আবদ্ধ কোরেছে একদা—সে গ্রন্থি ছিন্ন কোরে কোনো নোতুন দিগন্তের ডাক শুনতে পাচ্ছে নাকি গৌতম? তার ক্লান্ত পক্ষ কি আবার হাওয়ার আহ্বানে চঞ্চল হোয়ে উঠলো?

"তুমি কিছুই ভেবোনা অনুপমা"— ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে পড়লেন সোমনাথ,—"রাঁচীর সেণ্ট্রাল হস্‌পিটালের সুপারিনটেনডেণ্ট্‌ আমার বিশেষ বন্ধু। আমি এই মুহূর্ত্তেই তাকে টেলিগ্রাম কোরে দিচ্ছি।" এক মুহূর্ত্ত আর দাঁড়ালেন না সোমনাথ। চলে গেলেন যেমনভাবে এসেছিলেন। আর অনুপমা আকাশ পাতাল ভেবেও কোনও কূল কিনারা পেল না। মনে হোল যেন একটু একটু কোরে সে ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রে। তবু তীরের অসংখ্য লোকের ভেতরে কেউ তাকে হাত ছানি দিয়ে ডাক্‌ছে না।

সন্ধ্যের ট্রেণে গৌতমের চলে যাওয়া স্থির হোল। অনুপমা সেদিন সমস্ত বিকেল ভরে কাঁদলো। গৌতমকে ছেড়ে একটি মুহূর্ত্তও কোথাও উঠলো না। ভাবলো, যাবার আগে একবার রাঙিয়ে দি গানে গানে, প্রাণে প্রাণে, আর দুটি ব্যাকুল বাহুর বন্ধনে বন্ধনে।

কিন্তু সেদিন একটি বারো অরুণাকে গৌতমের কাছে দেখা গেল না। সমস্ত দিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ালো। আর ভাব দেখালো যেন সে গৌতমকে চেনে না। অথচ যার জন্য এত উদ্বেগ, যার নব জীবন-প্রাপ্তির জন্য অন্তরে অন্তরে এমন গোপন

সাধনা, সেকি আজ তার যাবার আগে এতটুকু কাঁপলো না। এতটুকু কাঁদলো না একবার !

সেদিনকার মত দরজাব সামনে এসে টম্‌টম্‌ দাঁড়ালো। সোমনাথ বাবু গাড়ী থেকে নেমে এলেন ঘরের ভেতবে। তিনটি স্তম্ভিত মূর্ত্তির গায়ে তিনি প্রথম ছড়ালেন কল-কল্লোল।

"কই, নিয়ে এসো ওকে গাড়ীতে অনু।" অস্থিব হোয়ে উঠলেন যেন সোমনাথ।

"এই যে সব প্রস্তুত" সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে যেন অবসাদ জড়িয়ে আস্‌ছে—স্বপ্নাতীত আঘাতে সমস্ত পৃথিবী ভেঙে চূর্ণ হোয়ে যাচ্ছে যেন তার চোখের সাম্‌নে থেকে, এমনিভাবে চোখ ছুটি তুলে ধোবলো অনুপমা। পায়েব নীচে বোধ হয় তার ভূমিকম্প হোলো !

"দিদি !" দূবে ছিল অরুণা, চকিত বিদ্যুৎ-লেখার মত আকাশ দীপান্বিত কোবে ছুটে এলো অনুপমার কাছে। সে আকস্মিক দীপ্তিতে গৌতমকেও যেন কিছুটা চঞ্চল দেখালো।

"কী ?"—এই বাধাটি অনেকদিন পব যেন ভালো লাগলো অনুপমার। একটি অপরিস্ফুট আশ্বাস যেন তাতে সে অনুভব কোরলো।

"গৌতমকে আমায় তুই উপহাব দে !" ছুটি বাহুলতায় অনুপমাকে বেষ্টন কোরে তাব বুকেব ভেতরে মুখ লুকোলো

অরুণা,—“আমাকে নিঃশেষ কোবে ওকে তবু উজ্জ্বল কো.র তুল্‌বো।”

উত্তব দিতে গিয়ে পাথবেব মত স্তম্ভিত হোয়ে গেল অনুপমা। আব অরুণা একবাবো দেখলো না তাব দুটী চোখেব প্রান্ত থেকে সহস্র অশ্রু-বেখায় টলমল কোবে উঠলো অনুপমাব সর্বাঙ্গ।

সমাপ্ত